অক্টোবর মাস: জপমালা রাণীর মাস

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৬ ❖ ৮ - ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

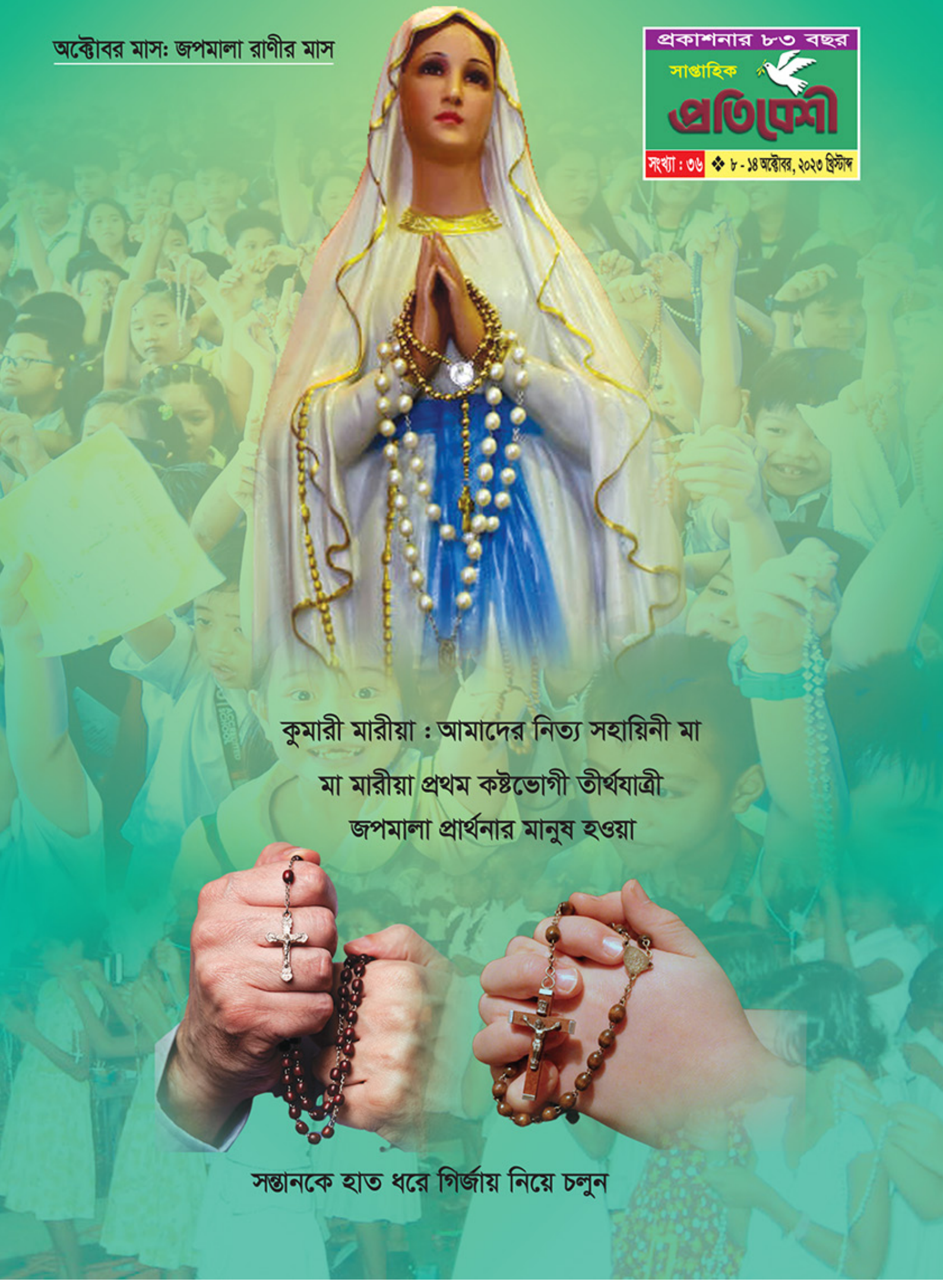

কুমারী মারীয়া : আমাদের নিত্য সহায়িনী মা

মা মারীয়া প্রথম কষ্টভোগী তীর্থযাত্রী

জপমালা প্রার্থনার মানুষ হওয়া

সন্তানকে হাত ধরে গির্জায় নিয়ে চলুন

২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জন গমেজ
জন্ম : ১৪ নভেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার
মৃত্যু : ১০ অক্টোবর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

মরণসাগর পাড়ে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি ।

তুমি একদিন সকলকে আনন্দিত করে এসেছিলে এই ধরণীতে। আবার একদিন আমাদের সকলকে রাতের অন্ধকারে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে। কখন যে ২৬টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের মনেই হয় না। তুমি চলে গেছো ঠিকই কিন্তু তোমার চিন্তা-চেতনা, তোমার মতাদর্শ, তোমার কীর্তি ও তোমার পথপ্রদর্শন আমাদের যেমন মনে করিয়ে দেয় তেমনি সমাজে অনেকেই তোমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং তা চিরদিন স্মরণ করবে।

প্রিয় ভাই, দেখতে দেখতে একটি বছর চলে এলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করি।

প্রয়াত আলফ্রেড গমেজ
জন্ম : ১৭ মে, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পরিবারের পক্ষে–
কানন গমেজ

গমেজ বাড়ি, শুলপুর ধর্মপল্লী
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

বিজ্ঞ/৩০৮/২৩

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত অব্রাহাম গিলবার্ট ফ্রান্সিস
জন্ম: ১ মে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

"........ আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে
তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা"

প্রয়াত এরিক ফ্রান্সিস
জন্ম: ৪ মার্চ, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

তুমি আমায় বলেছিলে, "আমার কাছে চলে এসো। এক সঙ্গে চিকিৎসা করে, সুস্থ হয়ে, এক সঙ্গে ঘরে চলে যাব।" করোনা আমায় তোমার কাছে যেতে দেয়নি, তোমার বড্ড অভিমান হল, তাই তো আমায় এপারে রেখেই তুমি ওপারে ভেলা ভাসালে। আমি ভুলতে পারছি না আজও তোমার ঐ কথা গুলো–"চলে এসো...।" ভুলতে পারছি না কবর স্থানের পাশে এ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে তোমার রাত্রি যাপন। করোনা তোমার আপন আবাসে ফিরতে দিল না। আমাদের গলিটায় দু'জন বয়স্ক লোক ঠিক তোমার মত করে হাঁটতে দেখি। কি সন্তর্পণে মন্থর গতিতে তুমি হেঁটেছ, কোন ক্রমেই যেন পড়ে না যাও। গ্রামে তোমার পছন্দের বসার জায়গাটাও কেমন ফাঁকা পড়ে আছে। পারিবারিক আনন্দ উৎসবে তোমাকে খুব মিস করি। বিশেষ করে নাতী- নাতনীদের জন্মদিনে। আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করো যেন তোমার জীবন আদর্শে চলতে পারি। এরিকেরও নানা স্মৃতি আজও সকলকে কাঁদায়, ব্যথিত করে। পিতা পরমেশ্বর তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করুন, এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

তোমাদের শোকার্ত
ফ্রান্সিস পরিবার

বিজ্ঞ/৩০৪/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৩৬
৮ - ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২৩ - ২৯ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

রোজারি মালা প্রার্থনার শক্তি

প্রার্থনার শক্তিতে সকল ধর্মের মানুষের বিশ্বাস আছে। গভীর বিশ্বাস নিয়ে কোন কিছু যাচ্না করলে তা পাওয়া যায়। পবিত্র বাইবেলে প্রভু যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেন, তোমরা প্রার্থনা করো যাতে প্রলোভনে না পড়ো। একইভাবে অপশক্তিকে পরাভূত করার জন্যও যিশু তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনার পরামর্শ দিয়েছেন। পুত্রের সাথে একাত্ম হয়ে মা মারীয়াও জগতের বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়ে সকলকে প্রার্থনা করতে বিশেষভাবে মন পরিবর্তনের জন্য রোজারিমালা প্রার্থনা করতে বলছে। কুমারী মারীয়ার প্রতি কাথলিকদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকার কারণে তাদের কাছে রোজারিমালার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। তাই প্রাচীনকাল থেকেই রোজারিমালা প্রার্থনা পারিবারিক ও সামাজিক প্রার্থনার অপরিহার্য অংশ হিসেবে প্রচলিত।

অক্টোবর মাস জপমালার রাণীর মাস। কাথলিক খ্রিস্টানগণ যিশুর মা কুমারী মারীয়াকে সম্মান দেখিয়ে বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিতা করেন। 'জপমালা রাণী' মারীয়া তেমনি একটি। তবে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুমারী মারীয়াকে জপমালার রাণী আখ্যা দেওয়া হয়। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর লেপান্তের যুদ্ধে শক্তিশালী তুর্কি বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল রোজারি বা জপমালা প্রার্থনার শক্তিতেই। অপশক্তির বিরুদ্ধে জপমালা প্রার্থনা একটি হাতিয়ার। এই সহজ-সরল প্রার্থনা অবলম্বন করেই অনেক বিশ্বাসী ভক্ত তাদের জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কেননা বিশ্বাসী ভক্তকূল মনে করে মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর মায়ের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পূর্ণপ্রকাশ জপমালা প্রার্থনা। এই প্রার্থনা করে বর্তমান সময়েও অনেকে বিপদ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন, অন্তরে শান্তি পাচ্ছেন, নিরাশায় আশা পাচ্ছেন এবং কোন কিছুতেই বিচলিত হচ্ছেন না। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্থাপিত হচ্ছে মিলন ও একতা। তাই পবিত্র রোজারিমালা প্রার্থনা হয়ে ওঠেছে অতিশয় শক্তিশালী প্রার্থনা। মা মারীয়া নিজেই জপমালা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেন।

আমরা পরিবারের মধ্যে দেখি সাধারণত মায়ের আদেশ- নির্দেশ সন্তানেরা পালন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তাই মায়ের নির্দেশ মেনে প্রতিটি পরিবার যেন জপমালা প্রার্থনা করে। প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা পরিবারকে একত্রে রাখে, সুন্দর ও পবিত্র রাখে। যেখানে একত্রে প্রার্থনা করা হয় সেখানে প্রভু যিশু ও মা মারীয়া উপস্থিত থাকেন। তাই জপমালা প্রার্থনা হলো পারিবারিক প্রার্থনা। এই পারিবারিক প্রার্থনার মধ্যদিয়ে মণ্ডলীকে প্রাণবন্ত রাখা যায়। ফলে প্রতিটি পরিবারকে আধ্যাত্মিকতায় সুস্থ-সুন্দর রাখতে হলে প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করা একান্ত আবশ্যক। পারিবারিকভাবে নিয়মিত মালা প্রার্থনা করলে আমাদের মধ্য থেকে অবশ্যই দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সন্দেহ, ভুল-বুঝাবুঝি, রেষারেষি, ঈর্ষা, কলহ কমবে। আর দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ক্ষমা, একতা, সহভাগিতা ও সহনশীলতা। খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতায় উৎকর্ষ সাধন ও পারিবারিক জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ মাধ্যম হলো জপমালা প্রার্থনা। যে পরিবার প্রতিদিন একসঙ্গে মালা প্রার্থনা করে, সে পরিবার সারা জীবন এক সঙ্গে থাকে। পরিবার ও পরিবারের সদস্যদেরকে বর্তমান সময়ের ভোগবাদ ও সুখবাদ থেকে রক্ষা করার একটি কার্যকর উপায় হবে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা।

অনেক পরিবার রোজারিমালা প্রার্থনার পর পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে একটু সময় আলাপ-আলোচনা করেন, যা নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখতে এবং শ্রদ্ধা-সম্মানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে। একসময়ে সন্ধ্যারতির মতোই গ্রামীণ ও শহুরের খ্রিস্টান পরিবারগুলোতে সন্ধ্যায় সুরেলা জপমালা প্রার্থনা যে স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতো তা বর্তমানের বাস্তবতায় ক্ষীয়মান হলেও জপমালা প্রার্থনা করার ইচ্ছাটিকে জাগ্রত করতে হবে। তাই জপমালার প্রার্থনার প্রতি অনীহা ও উদাসীনতা দূর করে নতুন করে শুরু হোক জপমালা প্রার্থনার নিয়মিত অনুশীলন। পরিবারগুলোতে দৃঢ় সংকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক যেন যেকোন মূল্যে পরিবারের অধিকাংশ সদস্য মিলে জপমালা প্রার্থনা করতে পারে। কেননা জপমালার শক্তিতেই নাশ হবে সকল অপশক্তি। বাস্তবতা বলছে যে পরিবারে রোজারি মালা প্রার্থনা নেই সে পরিবারে শান্তি নেই। তাই প্রতিটি পরিবারেই নিয়মিত জপমালা প্রার্থনা হোক আর সকলের মধ্যে শান্তি বজায় থাকুক। †

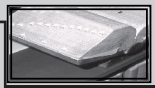

ফসল সংগ্রহের সময় এলে তিনি নিজের অংশ সংগ্রহ করতে কৃষকদের কাছে নিজের কর্মচারীদের প্রেরণ করলেন। - মথি ২১:৩৪।

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

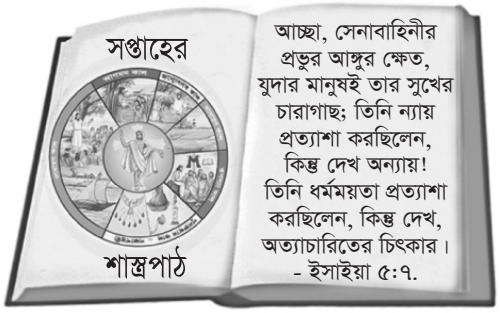

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৮ - ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৮ অক্টোবর, রবিবার
ইসা ৫: ১-৭, সাম ৮০: ৯, ১২-১৬, ১৯-২০, ফিলি ৪: ৬-৯, মথি ২১: ৩৩-৪৪

৯ অক্টোবর, সোমবার
সাধু ডেনিস, বিশপ এবং তাঁর সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ
সাধু জন লিওনার্দি, যাজক
যোনা ১: ১ -- ২: ১, ১১, সাম যোনা ২: ৩, ৪, ৫, ৮, লুক ১০: ২৫-৩৭

১০ অক্টোবর, মঙ্গলবার
যোনা ৩: ১-১০, সাম ১৩০: ১-৪, ৭খ-৮, লুক ১০: ৩৮-৪২

১১ অক্টোবর, বুধবার
সাধু এয়োবিংশ যোহন, পোপ
যোনা ৪: ১-১১, সাম ৮৬: ৩-৬, ৯-১০, লুক ১১: ১-৪

১২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
মালা ৩: ১৩-২০ক, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১১: ৫-১৩

১৩ অক্টোবর, শুক্রবার
যোয়েল ১: ১৩-১৫; ২: ১-২, সাম ৯: ১-২, ৫, ১৫, ৭-৮, লুক ১১: ১৫-২৬

১৪ অক্টোবর, শনিবার
সাধু প্রথম কালিস্তুস, পোপ ও ধর্মশহীদ
যোয়েল ৪: ১২-২১, সাম ৯৭: ১-২, ৫-৬, ১১-১২, লুক ১১: ২৭-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৮ অক্টোবর, রবিবার
+ ২০০৬ সি**স্টার লরেন্সা গমেজ** পিমে (রাজশাহী)
৯ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৮৩ ব্রাদার দামিয়ান ডি ডেল সিএসসি (ঢাকা)
১০ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৮ সিস্টার মেরী লাঙ্গুইডা আরএনডিএম
১১ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৭৩ সিস্টার এম জর্জ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সিস্টার মেরী সেলিন এমসি
+ ১৯৯৬ মাদার লুই এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
১২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ২০০৯ মাদার লুইজা পেন্নাতি এসসি (ঢাকা)
১৩ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ২০১৪ সিস্টার ফ্রান্সিসকা রোজারিও এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি (ঢাকা)
১৪ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৭৪ মন্সিনিয়র ইসিদোর দ্যা কস্তা, (ঢাকা)
+ ১৯৭৪ ফাদার ভালেরিয়ানো কব্বে এসএক্স (খুলনা)

প্রতিবেশী ৩০ সংখ্যা প্রসঙ্গে

প্রতিবেশী গত ৩০ সংখ্যা (২৭ আগস্ট-২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ) দেখলাম। প্রচ্ছদে পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ছবি দেয়া হয়েছে। পাশে লেখা ছিল "অনন্য সাধারণ গুণাবলীর অধিকারী ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী।" নিচে দুইজন ফাদার এবং সিস্টারের ছবি দেয়া হয়েছে সেলুলয়েডের ফিতার ভিতর। এবং সর্ব নিচে ডানে দেয়া হয়েছে একজন সিস্টারের ছবি। পাশে লেখা "নিবেদিত জীবনে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র সিস্টার মেরী তেরেজা।"

প্রতিবেশীর প্রচ্ছদে প্রয়াত আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ছবি দেখে ভেবেছিলাম তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন লেখা আছে এই সংখ্যায়। ফাদার আলবাট রোজারিও, ড. আলো ডি'রোজারিও এবং তার্সিসিউস গোমেজের লেখা ছাড়া আর কোন লেখা প্রতিবেশীর পাতায় দেখতে পেলাম না। বাকী ১৮টি ছোট বড় লেখা সিস্টার মেরী তেরেজা সম্বন্ধে লিখেছেন বিভিন্নজন। মোটকথা এই সংখ্যাটি সিস্টার মেরী তেরেজার লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে।

২ সেপ্টেম্বর যেহেতু আমাদের পরম পূজনীয় প্রয়াত আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর প্রয়াণ দিবস সেই হেতু আমরা তাঁর স্মৃতিচারণমূলক লেখাই প্রতিবেশীর পাতায় প্রত্যাশা রাখি। ২৭ আগস্ট প্রয়াত সিস্টার মেরী তেরেজার প্রয়াণ দিবস হওয়াতে তাঁর উদ্দেশ্যেই প্রতিবেশী এই সংখ্যাটি বিশেষ ভাবে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে তাঁর ছবিটিকে প্রধান্য দিলে মনে হয় আরো ভালো হতো। প্রচ্ছদে যে আরো চারজনের ছবি দৃশ্যমান তাদের সম্পর্কে প্রতিবেশীর এই সংখ্যায় কোথাও কোন লেখা দেখলাম না কেন বোধগম্য হচ্ছে না। এমন কি সম্পাদক মহোদয়ের লেখায়ও তাদের সম্পর্কে কোন কথা দৃষ্টিগোচর হল না।

প্রতিবেশী আমাদের বাঙালি খ্রিস্টানদের মূখপত্র, তাই আরো সতর্কতার সাথে মুদ্রিত হলে ভালো। - ***অমল মিল্টন রোজারিও, মণিপুরীপাড়া, ঢাকা।***

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত। মতামত বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা পাঠান। - সম্পাদক

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক- লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্রবিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা।
ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবি ও পাঠিয়ে দিতে পারেন।
নভেম্বর মাস মৃতলোকদের মাস। মৃত্যু বিষয়ক আপনাদের লেখনী অতিশীঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (২য় তলা)
৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

সূত্র নং : ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লি:/সম্পাদক/২০২৩/১৯ তারিখঃ ০১/১০/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"**-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৩ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে ঢাকা আর্চ-ডায়োসিশান সেন্টার, মাদার তেরেজা ভবন, তেজগাঁও হলি রোজারী চার্চ ক্যাম্পাস, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ এ সমিতির ৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময় উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সভার স্থান : ঢাকা আর্চ-ডায়োসিশান সেন্টার, মাদার তেরেজা ভবন তেজগাঁও হলি রোজারী চার্চ ক্যাম্পাস, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
সভার তারিখ : ০৩ নভেম্বর' ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় : সকাল ১০:৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে

প্রিন্স এভ্যারিচ রোজারিও
সম্পাদক
ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

বিজ্ঞ/৩০৬/২৩

সাহায্যের জন্য আবেদন

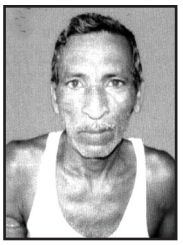

আমি অধীর ঘরামি, বরিশাল ধর্মপ্রদেশের গৌরনদী ধর্মপল্লীর কলাবাড়িয়া গ্রামের একজন হত দরিদ্র খ্রিস্টভক্ত। আমি বিগত এক বছর পূর্বে বরিশাল যাওয়ার পথে বড় দুর্ঘটনায় ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যাই, কিন্তু আমি গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই এবং আমার চিকিৎসা চলতে থাকে, আমার বাম হাতের হাড় সম্পূর্ণ ভাঙ্গা এবং এখনও জোড়া নিচ্ছে না, ডাক্তার বলেছে আরো উন্নত চিকিৎসা দরকার অনেক টাকা ব্যয় হবে। এই পর্যন্ত আমার অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে, নিজের সয়-সম্বল যা ছিলো তা দিয়ে এই পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়েছি, বর্তমানে আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। একদিকে আমার পরিবার অন্যদিকে আমার চিকিৎসা চালিয়ে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে।

তাই নিরুপায় হয়ে আমার সুস্থতার জন্য আপনাদের কাছে আর্থিক সাহায্য ও প্রার্থনা কামনা করি। আপনারা আমাকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে আমি আপনাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

অধীর ঘরামি
বিকাশ নাম্বার: ০১৯৭১-৮২৫৮৯৫
সোনালী ব্যাংক একাউন্ট: ৩৫০৯
নলচিড়া শাখা, গৌরনদী, বারিশাল

পাল-পুরোহিত
ফাদার রিংকু গমেজ
গৌরনদী ধর্মপল্লী

বড়দিন সংখ্যা ২০২৩ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৩" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৩ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

জপমালা প্রার্থনার মানুষ হওয়া

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

আমাদের প্রার্থনা প্রকাশ করে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা, জপ পো আমি মায়ের মালা। প্রায় ১৩০ কোটি কাথলিক বিশ্বাসীভক্ত মহাসমারোহে ৭ অক্টোবর জপমালার রাণীর পার্বণ উদ্‌যাপন করবেন। মাতৃবন্দনা মায়ের স্তব আমাদের চিত্তে জাগিয়ে তুলে এক অপরূপ শিহরণ। পাপ নরক অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে খ্রিস্টভক্তগণের হাতিয়ার হচ্ছে মারীয়ার জপমালা। জপমালা ভক্তসাধারণের জন্য মাতৃস্নেহ মাতৃ আশ্রয় ও মাতৃআশীর্বাদ লাভের উপায়। সমুধুর কণ্ঠে সুর তুলে গাই - "জপরে ভাই, দিবানিশি মেরী-নামের জপমালা। জপরে মালা দু'টি বেলা, রবে না ভাই মনের ময়লা। জপিয়ে ঐ নামের মালা, লুর্দে দর্শন পায় কৃষকবালা। ঐ নামের গুণে নামের বলে ভাল হয় কত অন্ধ-নুলা "। বিশ্বাসের তীর্থোৎসব করতে আমরা যাই মা মারীয়ার গ্রটোতে যেমন চট্রগ্রামের দিয়াং, ময়মনসিংহের বারমারীতে, ভারতের ব্যান্ডেলে, ভেলেংকেনীতে রাণী মা মারীয়ার কাছে আর জপমালা প্রার্থনা করি।

জমপালা রাণী মা মারীয়ার পর্ব পালনের সুত্রপাত

একটি যুদ্ধ, একটি বিজয়। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী নৌবহরের আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পোপ ৫ম পিউস সকল খ্রিস্টভক্তকে জপমালা উচ্চারণ করে ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাহায্য পাবার জন্য অনুরোধ করেন। রোজারী মালা প্রার্থনা করে লেপান্ত নামক স্থানে তুর্কীদের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে (Naval battle of Lepanto) জয়লাভ করেন। (It was said that the Christians were victorious because of the help of the holy Mother of God invoked by the saying of the Rosary.) এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৭ অক্টোবর উৎসবমুখর পরিবেশে জমপালা রাণী মা মারীয়ার পর্ব পালনের সুত্রপাত হয়। *(খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা বিতান, ৫১৯ পৃষ্ঠা)*।

আমি জপমালার বন্দিতা রাণী

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের ফাতিমা নামে একটি ছোট গ্রামে ধন্যা কুমারী মারীয়া তিনজন কিশোর রাখালকে (লুসিয়া, ফ্রান্সিসস্কো ও জাসিন্তা) ৬বার অলৌকিক দর্শন দেন। ১৩ মে, দুপুর বেলা তারা যখন খেলা করছে, হঠাৎ পরিষ্কার আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। তারা ভীত হয়ে দেখতে পেল, এক ওক গাছের ওপরে ভাস্যমান এক উজ্জ্বল মেঘের ওপর সূর্যের চেয়ে দীপ্তিময়ী একজন নারী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাদের বললেন, "ভয় পেয় না। তোমরা পর পর পাঁচ মাস একই ১৩ তারিখে এখানে আসবে। আমি তখন তোমাদের বলব, আমি কে আর কী চাই"। মারীয়া অনুরোধ করলেন, পৃথিবীতে যাতে শান্তি ফিরে আসে এবং পাপীর যেন মন পরিবর্তন করে, সেই কামনায় তারা যেন প্রতিদিন জপমালা জপ করে। ১৩ অক্টোবর, ৭০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে মা মারীয়া শেষে দেখা দিলেন। তিনি তখন শিশুদেও বললেন : **"আমি জপমালার বন্দিতা রাণী"**। *(খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা বিতান, ২১৫ পৃষ্ঠা)*।

জপমালা প্রার্থনার ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রেক্ষাপট আমরা সবাই জানি। প্রাচীন মণ্ডলীতে যখন সন্ন্যাসীরা ১৫০টি ছোট ছোট পাথর সংগ্রহ করে একটি চামড়ার থলিতে রেখে দিতেন, যখন প্রার্থনার সময় হত তখন তারা ১৫০টি সামসঙ্গীত একটি একটি করে আবৃত্তি করতেন। প্রতিটি সামসঙ্গীতের জন্য একটি করে পাথর থলি থেকে বের করে রাখতেন। পরবতীকালে সামসঙ্গীতের পরিবর্তে প্রভুর প্রার্থনা বলা হত পাথর গুণে গুণে। ঐ সময় পাথরগুলো গেথে মালা করা হয়। কিছুকাল পরে প্রণাম মারীয়া প্রার্থনাটি যুক্ত হয়। যুগ যুগ ধরে অনেক পরিবর্তনের পর জপমালা তাঁর বর্তমান আকৃতি লাভ করে এবং আমাদের জীবন যাত্রাপথে অনেক সান্ত্বনা দান করে থাকে।

বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব

জপমালার শক্তি আমাদের মুক্তি। জপমালার প্রার্থনার প্রতি ভক্তি-পরিবারের শক্তি। এক একটি গুটি যেন এক একটি বুলের মত। একটি প্রণাম মারীয়া বললে বুলেট লাগে শয়তানের গায়ে। রিপু যুদ্ধে পরীক্ষা প্রলোভনে, ভয়ে বিপদে উৎকণ্ঠায় অনিশ্চয়তায় জপমালা আমাদের হাতিয়ার, আমাদের রক্ষা বর্ম। যাপিত প্রাত্যাহিক জীবনে প্রলোভন পরীক্ষা হতে রক্ষা পাবার জন্য জপমালা হলো আধ্যাত্মিক অস্ত্র।

জপমালা প্রার্থনায় ফোকাস করা হয়, যিশু যা বলেছেন এবং করেছেন। আমরা যখন রোজারীমালা আবৃত্তি করি, তখন স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মারীয়াকে প্রণাম জানিয়ে, যিশুর জননীর সঙ্গে যিশুর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ধ্যান করি। মা মারীয়ার আদর্শ মনের সামনে রেখে যিশুর পদক্ষেপ অনুসরণ করতে চেষ্টা করি। সাধু পোপ ২য় জন পল বলেছেন : জপমালা প্রার্থনা হলো পবিত্র মঙ্গলসমাচারের সারসংক্ষেপ। ক্ষুদ্র সুসমাচার। ৬টা প্রভুর প্রার্থনা। ৫৩টি দূতের বন্দনা প্রার্থনা। ১৫টি নিগূঢ়তত্ত্ব এখন ২০টি। ২০০২ খ্রিস্টাব্দ পোপ ২য় জন পল যোগ দিয়েছেন জ্যোতির্ময় নিগূঢ়তত্ত্ব। পোপ বলেছিলেন যে, জপমালা প্রার্থনা করে আমি অনেক শক্তি অনেক সামর্থ পেয়েছি। তিনি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ ঘোষণা করেছিলেন জপমালার বর্ষ।

আমরা যখন জপমালা প্রার্থনায় স্তব করি তখন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করি মা মারীয়ার মাহাত্ম্য। মা মারীয়ার বন্দনা করা আমাদের জন্য সত্যই উচিত, কল্যাণকর, বিহিত ও ন্যায্য। তিনি প্রসাদে পরিপূর্ণা। লিতানী প্রার্থনা যখন করি তখন আমাদের প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হয়। মা মারীয়া বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। মা মারীয়ার বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন জায়গায়, স্থানে বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছেন কথা বলেছেন। মা মারীয়া বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধা ও আখ্যায়িত হয়েছেন শক্তিমতি কুমারী, দয়াময়ী কুমারী, বিশ্বস্ততা কুমারী ন্যায়ের দর্পন, প্রজ্ঞার আসন, স্বগের দ্বার, দুঃখীদের সান্ত্বনা দায়িনী, স্বর্গের রাণী, পরিবারের রাণী, শান্তির রাণী ইত্যাদি। ভক্তের করুণ আর্তিতে ছল ছল হয়ে ওঠে মা মারীয়া নয়ন। মা মারীয়ার অপরূপ রূপমাধুরী দেখলে আঁখি ফেরানো যায় না। মা মারীয়া আমাদের ভুলতে পারেন না। স্মরণ কর প্রার্থনায় আমরা প্রকাশ করি, "তোমার সাহায্য যে পায় নাই, এই কথা কে বলিতে পারে"। মণ্ডলীতে অনেক গির্জা জপমালা রাণী মারীয়ার নামে উৎসর্গীকৃত। যেমন বাংলাদেশের বিভিন্ন গির্জা যেমন ঢাকার তেজগাঁও'র গির্জা, চট্রগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল গির্জা, খুলনা ধর্মপ্রদেশের শিমুলিয়ার গির্জার নাম পবিত্র জপমালা রাণীর মা মারীয়া।

ঈশ্বরের সেবক জপমালার যাজক হলিক্রস ফাদার প্যাট্রিক পেইটন বলেছেন : যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একত্রে থাকে। জপমালা প্রার্থনাকে উৎসাহিত করার জন্য মণ্ডলীতে হলিক্রস ফ্যামিলি মিনিস্টি পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা প্রচার অভিযান বিশ্ব মণ্ডলীতে চালিয়ে যাচ্ছেন। জপমালার যাজক হলিক্রস ফাদার প্যাট্রিক পেইটন এর নাম করা বিখ্যাত উক্তি : প্রার্থনারত বিশ্বই শান্তিময় বিশ্ব।

জপমালা প্রার্থনা আবৃত্তিতে ক্লান্তি নেই

সংলাপ হচ্ছে ২ জনের মধ্যে। এক জন বলছে এক মারীয়ার ভক্তকে আচ্ছা তুমি বারে বারে পুনরাবৃত্তি করে শুধু জপমালা প্রার্থনায় প্রণাম মারীয়া বল। তুমি বিরক্ত হও না – অধৈর্য লাগে না। বিশ্বাসীভক্ত প্রতি উত্তরে বললেন" আচ্ছা, সত্যি করে তুমি বল তো – তুমি যখন তোমার প্রেমিকাকে বারে বারে বল - আমি তোমাকে ভালোবাসি - একই কথা রিপিট কর- তোমার প্রেমিকা কি বিরক্ত ক্লান্তিবোধ করে? করে না! তদ্রুপ আমিও বিরক্ত হই না, যখন বারে বারে প্রণাম মারীয়া বলি। জপমালা প্রার্থনা আবৃত্তি করা - আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাস (daily habit) হওয়া উচিত। জপমালা প্রার্থনা একটি শক্তিশালী (powerful) প্রার্থনা।

প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনার বর্তমান প্রেক্ষাপট

খুলনা ধর্মপ্রদেশের প্রয়াত বিশপ মাইকেল এ ডি' রোজারিও সিএসসি, এর শ্লোগান আমাদের অন্তরে অনুরণিত হোক : "প্রতিগৃহে জপমালা, প্রতি দিন সন্ধ্যাবেলা"। হতাশা ব্যঞ্জক মলিন নেতিবাচক দিক হলো অনেক পরিবার যেন কুরুক্ষেত্র পরিবার, কলহ বিবাদ রয়েছে। অনেক পরিবার প্রার্থনা বিহীন, মা মারীয়া বিহীন পরিবার। ঘরে হিন্দি সিনেমার গান অবিরত শোনা যায়। মা মারীয়ার গান শোনা যায় না। পরিতাপের বিষয় অনেক পরিবারে জপমালা প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনা করতে করতে একজন হয় স্বর্গদূত । আর প্রার্থনা না করতে করতে একজন হয় নরকের ভূত। কাজের ভূত। কাজ কাজ বিজি বিজি। কাজ স্বর্গে যাবার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কাজের ভূত হলে স্বর্গে যাওয়া যাবে না। কাথলিক মণ্ডলীতে ২৬৬ জন পোপ জপমালা প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছেন। আসুন, আমরা প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই । অন্তরে প্রত্যয় জাগ্রত হোক ।

উপসংহার

ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও ঐশজনগণ যুগে যুগে জপমালা প্রার্থনা জপ ও বিশ্বাস ঘোষণা করে আসছে। জপমালা প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার শক্তি। প্রার্থনার শক্তিতে মন্দের পরাজয়। বর্তমানের তরুণ সমাজের একাংশ বৈশ্বিক মূল্যবোধে প্রভাবিত হচ্ছে। পারিবারিক জীবন সুরক্ষায় জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব রয়েছে। পরিবারের পিতামাতাদের পরিমিতিবোধ, পরিনামদর্শিতার অভাবে, সন্তানেরা কম্পিউটার, নেট-ব্রাউজিং, মোবাইল চ্যাটিং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে আড্ডা নিয়ে সময় কাটায়। জপমালা প্রার্থনা করতে অনীহা শিথিলতা ঘাটতি রয়েছে। মনে প্রশ্ন উকি দেয় - ছেলে মেয়েরা আনন্দময়, (দূত সংবাদ, সাধ্বী এলিজাবেথের সহিত কুমারী মারীয়ার সাক্ষাৎ, বেৎলেহেমের গোশালায় যিশুর জন্ম, বালক যিশুকে মন্দিরে উপস্থাপন, বালক যিশুকে মন্দিরে পাওয়া) শোকময়, (গেৎসিমানী বাগানে যিশুর মর্মবেদনা, যিশুর গাত্রে কশাঘাত, যিশুর কন্ট মুকুট ধারণ, যিশুর ক্রুশ বহন, যিশুর ক্রুশারোপন) জ্যোর্তিময় (জর্দান নদীতে প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান, কান্না নগরে বিবাহ উৎসবে যিশুর আত্মপ্রকাশ, যিশু কর্তৃক ঐশরাজ্য প্রচার ও মন পরিবর্তনের আহ্বান, যিশুর দিব্য রূপান্তর, পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা) ও গৌরবময় (যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান, যিশুর স্বর্গারোহন, প্রেরিতগণের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ, কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, কুমারী মারীয়ার গৌরময় মুকুট ধারণ) নিগূঢ়তত্ত্বগুলো জানে কী! ছেলে মেয়েদের জপমালা প্রার্থনা আবৃত্তি করার অনুরাগ বৃদ্ধি করা জরুরী বিষয়। জপমালা রাণী মা মারীয়া সকল বিশ্বাসীভক্তদের তাঁর স্নেহাশ্রয়ে নিরন্তর রক্ষা করুন॥ ❑

কুমারী মারীয়াঃ আমাদের নিত্য সহায়িনী মা

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হল মা। কেননা মায়ের মধ্য দিয়েই আমরা এই জগত দেখার সুযোগ লাভ করেছি। মাকে চিনে আমরা আমাদের জীবনকে চিনেছি। মায়ের দেখানো পথে আমরা পথ চলছি। মায়ের শেখানো বাক্যে আমরা কথা বলছি। মায়ের দেওয়া শিক্ষায় আমরা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছি। সন্তানের কাছে মায়ের মত আপন অদ্বিতীয় আর কেউ নেই। অপরদিকে একজন মায়ের নিকটও তার সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে আদরের, সবচেয়ে স্নেহের ও প্রিয় তার সন্তান। প্রতিটি মায়ের একটাই বাসনা- আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। আমার জীবনে মা মারীয়াকে চিনিয়েছেন আমার জন্মদায়িনী মা। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে যখন শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভের গ্রাম্য পরিবেশ ও পরিজন ছেড়ে পড়াশোনার জন্য প্রথমবার ঢাকা শহরের উদ্দেশে পা বাড়াই; তখন আমার মা বাড়ির আঙিনা থেকে শুভকামনা জানিয়ে বলেছিলেন, "বাবা, আজ থেকে আমি তো বাড়িতেই থাকব কিন্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গে একজন মা সারাক্ষণ থাকবে; তিনি মা মারীয়া। আমাকে তো আর যখন তখন সব কথা বলতে পারবে না! তাই মা মারীয়াকে সবকিছু ব'লো, তিনি তোমার সব কথা শুনবেন। তিনিই তোমাকে সব বিষয়ে পরামর্শ দিবেন।" জীবনের এই পর্যায়ে আমি আমার মাকে যতটুকু জানি, মা মারীয়াকেও ঠিক ততটুকুই জানি। আমি আমার মাকে যতটুকু ভালবাসি, মা মারীয়কেও ঠিক ততটুকু ভালবাসি। ধন্যা মা মারীয়া প্রভু যিশুর মা; প্রভু যিশু ঈশ্বর। তাই তিনি ঈশ্বরের মা, ঈশ্বরের পরম অনুগৃহিতা পুণ্যময়ী মা। আমাদের মায়েদের মত মা মারীয়াও যিশুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন। যিশুর হাত ধরে তাঁকে সেই স্বপ্নের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। সেই স্বপ্নের মধ্যে তিনি নিজেও অবস্থান করেছেন।

মা মারীয়া নিজ জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন এবং পুত্রের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনার্থে সার্বিক সহায়তা দান করেছেন। জীবনের বাস্তবতায় ও সময়ের পূর্ণতায় আমাদেরই পরিত্রাণের জন্য যিশুর ভারী ক্রুশকাষ্ঠ বহন, সীমাহীন যাতনাভোগ এবং চরম ঘৃণিত দস্যুর মত ক্রুশের উপরে যিশুর নির্মম মৃত্যু-দৃশ্য মা মারীয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কুক্ষিদেশে বর্শাবিদ্ধ করলে তাতে মায়ের হৃদয়ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। কুমারী মারীয়ার মানসিক দুঃখ-কষ্ট পৃথিবীর যে কোন দুঃখ-কষ্টের চেয়েও বেশী বেদনাদায়ক! আসলে তিনি এই সব মেনে নিয়েছিলেন আমাদের কথা ভেবে। তিনি জানতেন যিশুর মধ্য দিয়েই জগত লাভ করবে পরিত্রাণ, লাভ করবে শাশ্বত জীবন। প্রভু যিশুর জন্মের আটদিন পর যোসেফ ও মারীয়া যিশুকে জেরুসালেম মন্দিরে নিয়ে এলে পর ঈশ্বরের আপন মানুষ সাধু শিমিয়োন মা মারীয়াকে বলেছিলেন, ''এই যে শিশু, এ একদিন হয়ে উঠবে ইস্রায়েল জাতির অনেকের পতনের কারণ আবার অনেকের উত্থানের কারণ। এ হয়ে উঠবে অস্বীকৃত এক ঐশ নিদর্শন... আর তোমার নিজের প্রাণও বিদীর্ণ হবে তীক্ষ্ণ খড়্গের আঘাতে" *(লূক ২:৩৪-৩৫)* । এই উক্তির মাধ্যমেই যিশু ও মা মারীয়ার সমগ্র জীবনের দুঃখ কষ্টের ইঙ্গিত নিহিত।

জীবন বাঁচানোর জন্য সদ্যজাত শিশু যিশুকে নিয়ে মিশর দেশে পলায়ন মা মারীয়ার জীবনে কম কষ্টের ছিল না! রাজা হেরোদের চরম নিষ্ঠুরতায় ঈশ্বরের মহাদূত গাব্রিয়েল কুমারী মারীয়ার স্বামী যোসেফকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, শিশুটিকে ও তাঁর মা'কে নিয়ে মিশর দেশে পলায়ন করতে *(মথি ২:১৩-১৪)*। রাতের সেই মুহূর্তেই তাঁরা গাধার পিঠে চড়ে ৪০০ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে মিশর দেশে পৌঁছেছিলেন। কিশোর যিশুকে বার বছর বয়সে জেরুসালেম মন্দিরে হারিয়ে কুমারী মারীয়া ও সাধু যোসেফ তিনদিন পর তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই তিনদিন মা মারীয়ার হৃদয়ের অবস্থা কেমন হয়েছিল? যিশুকে হারিয়ে মা মারীয়া এতই ব্যথা-বেদনার মধ্যে ছিলেন যে তিনদিন পরে যিশুকে খুঁজে পাওয়া মাত্র তাঁর প্রথম উক্তি ছিল, 'বাবা, আমাদের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার?" *(লুক ২:৪৮)*। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে মা মারীয়ার স্থান সকলের উর্ধ্বে। তিনি নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আজীবন প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি ঐশ ইচ্ছা ও পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়ে ঈশ্বরকে মানুষ হয়ে এই জগতে আসার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি যে বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন তা অক্ষুন্ন রেখেছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। প্রভু যিশুর জন্মের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর পর্যন্ত প্রতিটা মুহূর্তে তাঁর বিশ্বাস ও ঈশ্বরপ্রেম পরীক্ষিত হয়েছে। সাধু ইরেনিয়াস বলেন, "ধন্যা মারীয়া নবীনা হবা ও জীবনদায়িনী। তিনি ঈশ্বরের বাক্য নিজ অন্তরে গেঁথে তা ধ্যান করেছেন। তাঁর এ বিশ্বাসকে তিনি শুধু নিজের কাছে রাখেননি। তা বয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর বোন এলিজাবেথের কাছে। যিনি বলেছিলেন, দেখতো তোমার অভিবাদন যেই আমার কানে এলো, এমনি আমার গর্ভের শিশুটি আনন্দে নড়ে উঠল।" এই আনন্দ মুক্তির আনন্দ, এই আনন্দ ঈশ্বরের মানব দেহ ধারণের আনন্দ। মা মারীয়া আমাদের আনন্দের কারণ! আমাদের আনন্দ যেন বিনষ্ট না হয়, তিনি সে ব্যাপারে সচেতন; কানা নগরে বিয়ের অনুষ্ঠানে হঠাৎ দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়াতে মা মারীয়া যিশুকে বলেছিলেন, ''ওদের দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেছে। তিনি যিশুকে দেখিয়ে চাকরদের বললেন, উনি তোমাদের যা করতে বলেন, তোমরা তা-ই কর" *(যোহন: ২:৩)* ।

মা মারীয়া অমলোদ্ভবা; জন্মের পূর্ব থেকেই তিনি আদিপাপ বর্জিতা। স্বর্গমর্তের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নিজেই তাঁকে বেছে রেখেছিলেন তাঁর মা হওয়ার জন্য। প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের পর থেকেই মা মারীয়া খ্রিস্টমণ্ডলীর পরম শ্রদ্ধার আসনে আসীন। সৃষ্টির আরম্ভে ঈশ্বর আদিমাতা হবাকে যে জীবন দান করেছিলেন, তিনি সেই জীবনে সমগ্র মানবজাতির মা হয়ে ওঠেন। এদিকে কুমারী মারীয়াকে ঈশ্বর যে জীবন দান করেছিলেন, সেই জীবন ছিল নবজীবন; যার দ্বারা তিনি ঈশ্বরপুত্রের মা হয়ে উঠেছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি মা মারীয়ার গভীর বিশ্বাস ও ভরসার কারণেই মানব মুক্তির পরিত্রাণ সূচিত হয়েছে। দ্বিতীয় শতকের মহান লেখক তের্তুলিয়ান হবা ও কুমারী মারীয়ার বিশ্বাসকে বর্ণনা করেন এই ভাবে, "প্রথম নারী হবা সাপকে (মন্দতা) বিশ্বাস করেছিলেন, তাই তিনি জন্ম দিয়েছেন মন্দতা, যা বংশ পরম্পরায় আজও মানব জীবনে আদিপাপ হিসেবে বিদ্যমান। এদিকে দ্বিতীয় নারী ধন্যা কুমারী মারীয়া বিশ্বাস করেছিলেন স্বর্গদূতকে (পবিত্রতা), তাই তিনি জন্ম দিয়েছেন পরিত্রাতাকে; যিনি মানুষের হারানো মর্যাদাকে ফিরিয়ে এনে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন।"

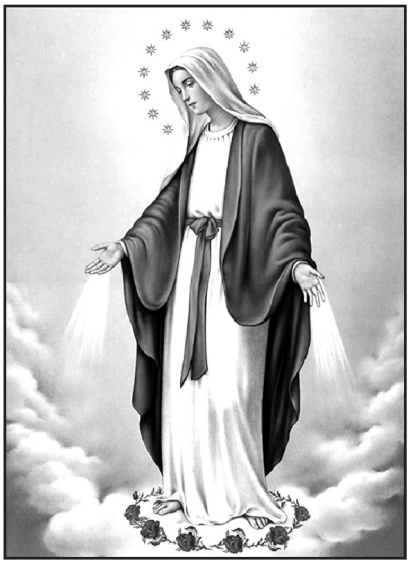

ঈশ্বর জননী ধন্যা মা মারীয়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের সকলের মা। কেননা প্রভু যিশু নিজেই ক্রুশের উপর থেকে মা মারীয়াকে সমগ্র মানব জাতির মা হিসেবে আমাদের দান করেছেন, যাতে আমরাও ঈশ্বর জননী মারীয়াকে মা বলে ডাকতে পারি। তাঁর মধ্যস্থতায় যিশুকে আরও গভীর ভাবে জানতে ও অনুসরণ করতে পারি। যিশুকে অনুসরণ করার জন্য মা মারীয়া হলেন আমাদের জন্য উত্তম পথ প্রদর্শিকা। তাঁর মত ক'রে পৃথিবীর কেউই যিশুকে জানেননি এবং অনুসরণও করেননি। এ কারণেই আমরা ধন্যা কুমারী মারীয়াকে গভীর শ্রদ্ধাভরে মা ব'লে ডাকি। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মা মারীয়াকে বাদ দিয়ে মুক্তির ইতিহাস অসম্পূর্ণ। কেননা যেদিন থেকে মা মারীয়া ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নম্রভাবে হ্যাঁ বলেছেন, সেদিন থেকেই তাঁর জীবনটা ছিল ঈশ্বর-নির্ভর। খ্রিস্টমণ্ডলীতে কুমারী মারীয়াকে বলা হয় 'সন্ধিনিয়মের সিন্ধুক'। তিনি নতুন সন্ধি নিয়মের সিন্ধুক। প্রাক্তন সন্ধিতে 'সন্ধি নিয়মের সিন্ধুক' ছিল ঈশ্বরের নিত্য উপস্থিতির প্রতীক। নব সন্ধিতে কুমারী মারীয়া সন্ধি নিয়মের সিন্ধুক কারণ তিনি নিজ গর্ভে ঈশ্বরের পুত্রকে ধারণ করেছেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে। পরাক্রমশালী ঈশ্বরের উপস্থিতি সর্বদা কুমারী মারীয়ার মধ্যে ছিল। এজন্যই মণ্ডলীতে মা মারীয়া আমাদের ভক্তির উচ্চাসনে বিদ্যমান।

সাধু পল বলেন, "যখন সময় পূর্ণ হল, তখন পরমেশ্বর এই পৃথবীতে পাঠালেন তাঁর আপন পুত্রকে; তিনি জন্ম নিলেন নারীগর্ভে, জন্ম নিলেন মোশীর বিধানের অধীন হয়ে। এমনটি ঘটেছিল, যাতে তিনি বিধানের অধীনে পড়ে থাকা যত মানুষের মুক্তিমূল্য দিতে পারেন, যাতে আমরা হয়ে উঠতে পারি পরমেশ্বরের পুত্র" *(গালা ৪:৪-৫)*। আমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে মা মারীয়ার মত যিশুর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখি, তখন আমরাও উপলব্ধি করতে পারব ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভরতা। উপলব্ধি করতে পারব সীমাহীন কষ্টের মাঝেও মা মারীয়া ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে যিশুকে যেমন ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করতে শক্তি দিয়েছিলেন তেমনি আমাদেরকেও তিনি শক্তি দেন। ধন্যা কুমারী মারীয়া তাঁর ত্যাগ, দুঃখকষ্ট ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিদায়ী কাজে অংশগ্রহণ করেন। আর এজন্য তিনি এক সন্তানের পরিবর্তে সমগ্র মানব সন্তানের মাতা হয়ে উঠেছেন।

প্রেরিতশিষ্য সাধু যোহন যিনি, প্রভু যিশুর মৃত্যুর পর মা মারীয়াকে তাঁর নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর প্রত্যাদেশ গ্রন্থের বারো অধ্যায়ে গৌরবময়ী নারী ধন্যা কুমারী মারীয়া সম্পর্কে বলেছেন, "সূর্য-বসনা এক নারী; চন্দ্র তাঁর পদতলে, তাঁর মাথায় বারোটি তারার মুকুট; সন্তান-সম্ভবা তিনি, চিৎকার ক'রে কাতরাচ্ছেন যন্ত্রণায়, প্রসব-বেদনায়!" আমরা কুমারী মারীয়ার অনুরাগী ভক্ত সন্তান। আমরা মা মারীয়াকে ভালবাসি; আমাদের জীবনে আমরা তাঁর মূল্য বুঝি। অথচ যারা তা বুঝে না, তারা মা মারীয়া থেকে সাড়ে আট হাজার মাইল দূরে রয়েছেন! তাদের কাছে মা মারীয়া নিছক সাধারণ একজন নারী। এখানে সাধু যোহন বলেন, "পৃথিবী তখন সেই নারীকে বাঁচাতে এগিয়ে এল!...নাগদানবটা সেই নারীর ওপর নিদারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে তখন যুদ্ধ করতে ছুটল তাঁর অন্য সন্তানদের বিরুদ্ধে; অর্থাৎ, সেই তাদেরই বিরুদ্ধে, যারা পরমেশ্বরের সমস্ত আদেশ পালন ক'রে থাকে, যারা যিশুর সাক্ষ্যবাণীর প্রতি আনুগত্যই দেখিয়ে থাকে" (প্রত্যাদেশ ১২:১-২, ১৬-১৭)। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, আমাদের একজন মা আছেন! তিনি স্বর্গোন্নীতা রাণী, তিনি দয়াময়ী জননী! তিনি আমাদের নিত্য সহায়িনী!! ❑

মা মারীয়া প্রথম কষ্টভোগী তীর্থযাত্রী

টমাস রনি গোমেজ

মানুষ হিসেবে জন্ম নিলে আমাদের অবশ্যই দুঃখকষ্টের মধ্যদিয়ে যেতে হয়। মানব জীবনকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব আমাদের জীবনের শুরুই হয়েছিল এক কষ্টের মধ্যদিয়ে। যেখানে মায়ের গর্ভের সেই স্বর্গীয় সুখ ছেড়ে যখন পৃথিবীর বুকে আমাদের জন্ম হয় তখন আমাদের সে কষ্ট অনেকের জন্য আনন্দ বয়ে এনেছিল। একইভাবে এই পৃথিবীর মধ্যে ঐশ সান্নিধ্যের স্বাদ আস্বাদন করার পর যখন নির্বিঘ্নে বলতে পারবো পিতা তোমারই হাতে আমার প্রাণ সঁপে দিলাম" *(লুক ২৩:৪৬)*। তখন পৃথিবী ত্যাগ করার আমাদের সে আনন্দ আবার অনেকের কষ্টের কারণ হয়ে উঠবে। তাই দেখি একজনের কষ্ট সবার আনন্দের কারণ আবার একজনের আনন্দ অনেকের কষ্টের কারণ। কিন্তু এই দুঃখ কষ্ট কি শুধুই দুঃখ কষ্ট? নাকি এর পেছনে কোনও কারণ রয়েছে? এটা কি ঈশ্বরের অভিশাপ নাকি এর পেছনে মহৎ কোন পরিকল্পনা রয়েছে? তা আবিষ্কার করতে পারলে আমাদের দুঃখ কষ্ট কখনোই দুঃখ কষ্ট থাকবে না। এর মধ্যেও আমরা মানব জীবনের সৌন্দর্য ও সার্থকতা খুঁজে পাব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "পৃথিবীতে এসে যে লোক দুঃখ পেল না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেল না - তার পাথেয় কম পড়ে গেল।"

ঠিক একই ভাবে একজন বিশ্বাসী হিসাবে, বিশেষ করে খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে যদি আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট না আসে তাহলে আমরা বিশ্বাসের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারব না। খ্রিস্টের জীবনের সেই নিগূঢ় রহস্যে প্রবেশ করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ খ্রিস্ট তাঁর মানবীয় জীবনের শুরু হতেই দরিদ্রতা, অভাব, অপমান, নির্যাতন ও কষ্টের মধ্যদিয়ে যাত্রা করে গৌরবের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। মানবীয় দুঃখ কষ্ট তাঁর কাছেও বোঝার মতোই ছিল। জীবনের এক পর্যায়ে তিনিও বলতে বাধ্য হয়েছেন "দুঃখে আমি যেন মরতে বসেছি" *(মথি ২৬:৩৬)*। কিন্তু সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি। পরবর্তীতে তিনি যা বলেছেন, আমরাও যেন সেই একই কথা আমাদের জীবনেও বলতে পারি। আর তা হল "তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক" (*মথি ২৬:৩৯*)।

যিশুর মানবীয় জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক মুহূর্তে মা মারীয়া তার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি যেহেতু ধার্মিকা নারী ছিলেন, তাই শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন এবং শাস্ত্র সম্বন্ধে জানতেন। তিনি হয়তো প্রবক্তা জেরেমিয়ার সেই কষ্টভোগী সেবকের কথাও জানতেন। আর যেহেতু খ্রিস্ট সেই কষ্টভোগী সেবক। তাই তিনি তার মাতা হওয়াতে হয়ে উঠলেন কষ্টভোগী মাতা। যিনি সেই দূত সংবাদে 'ফিয়াৎ' বলার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠলেন কষ্টভোগী মাতা। খ্রিস্টকে তাঁর জীবনে গ্রহণ করার মুহূর্ত হতে তাকে ক্রুশের তলায় পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত তিনি হলেন খ্রিস্টের জন্য প্রথম কষ্ট ভোগী তীর্থযাত্রী। তিনি এই কষ্টের তীর্থযাত্রা করেছিলেন তেত্রিশটি বছর। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে তিনি এই কষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। যদিও আমরা তাঁর জীবনের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাধিক কষ্টের কথা স্মরণ করে থাকি। তাঁর সেই কঠিন মুহূর্তগুলোর সঙ্গে আমরা আমাদের জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলো মিলিয়ে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করে থাকি। তাঁর জীবনের এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ কষ্ট হল।

প্রথম, সাধু শিমিয়োনের ভবিষ্যৎ বাণী (*লুক ২:৩৪-৩৫*)

দ্বিতীয়, মিশর দেশে পলায়ন (*মথি ২:১৩-২১*)

তৃতীয়, যিশু কে হারানো (*লুক ২:৪১-৫০*)

চতুর্থ, যিশুর ক্রুশ বহন দর্শন (*যোহন ১৯:১৭*)

পঞ্চম, যিশুর ক্রুশের মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শন (*যোহন ১৯:১৮-৩০*)

ষষ্ঠ, যিশুর মৃতদেহ কোলে লওয়া (*যোহন ১৯:৩৯-৪০*)

সপ্তম, যিশুর সমাধি দর্শন (*যোহন ১৯:৩৯-৪২*)

শুধু এগুলোই নয়। এছাড়াও তাঁর জীবনে আরও অনেক কষ্ট ছিল। যেমন যখন যিশুকে গ্রহণ করতে মানুষ অস্বীকার করে, তাঁকে অপমান করে, মন্দির থেকে তাড়িয়ে দেয় ও তাঁর কথার বিরোধিতা করে- মা হিসেবে এগুলোও ছিল তার জীবনের জন্য কষ্ট। কিন্তু যে প্রধান সাতটি কষ্ট নিয়ে আমরা ধ্যান করি তার প্রচলন পেয়েছিল মধ্য যুগেই। প্রায় ১২৩২ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইতালির ফ্লোরেন্সের, টাস্কানির সাতজন যুবক সার্ভাইট (Servite Order) নাম নিয়ে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। এর ঠিক পাঁচ বছর পর তারা পবিত্র ক্রুশের নীচে দাঁড়িয়ে তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রধান আদর্শ হিসেবে বেছে নেয় 'মারীয়ার দুঃখকে'। তারা মা মারীয়ার জীবনের বিভিন্ন কষ্টগুলো নিয়ে ধ্যান করত এবং প্রার্থনা করত। যতদূর সম্ভব তারাই প্রথম সম্প্রদায় যারা মারীয়ার দুঃখকে প্রধান ভক্তির বিষয় হিসেবে লালন করে আসছে। প্রধানত ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির দোলনের প্রাদেশিক সিনডের পর বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে সপ্তশোকের পর্বটির প্রচলন হয়েছিল। আর এটি তখন পালন করা হত পুনরুত্থান কালের তৃতীয় রবিবারের পরের শুক্রবার। আর এই পর্বের নাম ছিল ধন্যা কুমারী মারীয়ার বেদনা ও দুঃখের পর্ব (Commemoratio augustix et doloris B. Marix V.)। আর এর উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধকরণ ও মৃত্যুর সময় মারীয়ার দুঃখের কথা স্মরণ করা। ১৬০০ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত শুধুমাত্র উত্তর জার্মানি, স্কর্টল্যান্ড সহ, ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই পর্ব। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এটি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই ভক্তির প্রার্থনা ছড়িয়ে পরে ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৪ হতে ১৫ শতকেই এটি প্রায় সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পরে। ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে পর্বটি প্রথম রোমান মিশালে (The Roman Missal) যুক্ত হয়। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ১৩ বেনেডিক্ট, পর্বটিকে তালপত্র রবিবারের আগের শুক্রবারে পালনের জন্য বলেন। ১৮১৪ খ্রিস্টব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর পোপ সপ্তম পিউস ফ্রান্স নির্বাসনের পর রোমে প্রত্যাবর্তনের দিন পর্বটি পালন করেন। পরবর্তীতে সমগ্র মণ্ডলীতে তিনি পর্বটি প্রসারিত করেন ও রোমান পঞ্জিকায় যুক্ত করেন সর্বশেষ পোপ দশম পিউস ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পর্বটি পালনের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করেন আর তা হল পবিত্র ক্রুশের বিজয় উৎসব পর্বের পরের দিন অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর যা আজ অবধি প্রচলিত।

সেই ক্রুশের তলায় যিশু যখন তার মা কে বললেন, মা ওই দেখো তোমার সন্তান। ঠিক সেই মুহূর্ত হতে মা মারীয়া আমাদের জন্য হয়ে উঠলেন প্রেমময়ী সান্ত্বনাদায়ী জননী। যে সকল জাগতিক, মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক বিষয়গুলো আমাদের কষ্ট দেয়, তিনি তার সবই জানেন। পোপ ২য় জন পল বলেন 'তিনি তাঁর সন্তানদের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা বোঝেন'। কারণ তিনি নিজেই তাঁর একমাত্র সন্তানের সঙ্গে সেই বেথলেহেম হতে কালভেরী পর্যন্ত কষ্টভোগ করেছিলেন। তার হৃদয়ও খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হয়েছিল। তাই সেই ক্রুশের তলায় তাঁর পুত্রের কাছ থেকে আমাদের সর্বদা ভালোবাসার ও রক্ষা করার যে প্রেরণ দায়িত্বও তিনি পেয়েছিলেন তা তিনি আজও চালিয়ে যাচ্ছেন। জগতের সকল ক্রুশীয় যন্ত্রণায় তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং রক্ষা করে যাচ্ছেন, যেন আমাদেরকে তিনি তার পুত্রের কাছে সেই ঐশধামে পৌঁছে দিতে পারেন। তাই আমাদের কর্তব্য হল সেই মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলা।

সহায়ক গ্রন্থ

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শান্তি নিকেতন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

২. কস্তা, ফাদার দিলীপ এস., *প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ীমাতা*। ঢাকা: প্রতিবেশী প্রকাশনী, ২০২০।

৩. S.J. PLUS, Rev. Raoul. *Mary in Our Soul Life.* New York: Fredrick Pustet Co., 1940.

৪. Catholic Encyclopaedia ❑

সন্তানকে হাত ধরে গির্জায় নিয়ে চলুন !

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

আমরা অনেকেই আমাদের সন্তানদের হাত ধরে গির্জায় নিয়ে আসি। ব্যাপারটা সত্যিই খুব ভালো। হাত ধরা মানে শুধু তো হাত ধরা নয়, বরং এই হাত ধরার অনেক নিগুঢ় অর্থ আছে। হাত ধরা মানে দায়িত্ব নেয়া, সমর্থন করা, সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করা। হাত ধরা বলতে বুঝি নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া, যে কোন পরিস্থিতিতে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়া। যার হাতটি ধরি তাকে নিরাপদে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার নিশ্চিত নিশ্চয়তা দেই। সে যেন কোনভাবেই দিকবিদিক না হয়, এদিকে ওদিক চলে না যায়, সেই দিকে খেয়াল রাখি। লক্ষ্য বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করা, হাত ধরার উদ্দেশ্য। ঘোড়ার যেমন লাগাম টেনে ধরে ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ও গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হয়; তেমনি হাতটি টেনে ধরি, সন্তান যেন বিপথে না যায়; সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ভুল পথে গেলে টেনে ধরা এবং যথার্থ পথে নিয়ে যাওয়া ও নিরাপত্তা নিশ্চত করা, এই তো হাত ধরার বিশেষত্ব। শিশু সন্তান চরম নির্ভরতা নিয়ে পিতা-মাতার হাত ধরে এগিয়ে চলে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস গুরুজনের দেখানো পথই যথার্থ পথ। এই ভরসায়ই তারা অভিভাবকের হাতটি শক্ত করে ধরে জীবন পথে এগিয়ে যায়।

হাত ধরে নিয়ে যাওয়া! শহর কিংবা গ্রামে সবখানেই এখন এই দৃশ্য আমাদের খুবই চেনা; মা-বাবা কিংবা ঠাকুরদা বা ঠাকুরমা তাদের ছোট শিশুকে হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন। শিশুর হাত অভিভাবকের এক হাতে আর অন্য হাতে কিংবা কাঁধে স্কুলব্যাগ। খুব সন্তর্পণে রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছেন, শিশু স্বাচ্ছন্দে স্কুলে যাচ্ছে। কোন ভয়, উদ্বেগ বা অনিরাপত্তার অনুভূতি নেই। কারণ হাতটি ধরে আছে তার পরিচিত কেউ, নির্ভরতার কেউ। শুধু স্কুলের দিনই না, ছুটির দিনেও এই একই দৃশ্য চোখে পড়ে। পার্থক্য শুধু হাতে/কাঁধে স্কুলের ব্যাগের পরিবর্তে নাচ বা গান শিখার উপকরণ। সংখ্যায় একটু কম কিংবা শুধুমাত্র সময়ের পার্থক্যে দলে দলে ছুটে যাচ্ছে তারা, হাতটি ধরে আছে অভিভাবক কেউ। ছুটির দিন, কিন্তু ব্যস্ততার কমতি নেই। কখনো কখনো তো দেখা যায় ছুটির দিনগুলিতে যেন আরো ব্যস্ততা বেড়ে যায়। আমরা আমাদের সন্তানদের লক্ষ্য পূরণের জন্য কত চেষ্টাই না করি। হাত ধরে নিবীড় পরিচর্চার মাধ্যমে লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাই, প্রতিদিন, প্রতি নিয়ত।

প্রতি বছর বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে সময় ভেদে প্রথম পাপস্বীকার ও প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তাপণ সাক্রামেন্ত দেওয়া হয়। ধর্মপল্লী ভেদে ছুটির দিনে, সপ্তাহে একদিন বা দু' দিন প্রস্তুতি ক্লাশ দেওয়া হয়। তখনও দেখা যায় শিশুর পিতা-মাতা বা অন্য কেউ প্রার্থীর হাতটি ধরে ক্লাশে নিয়ে আসে। যতক্ষণ ক্লাশ চলে অনেকেই অসীম ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করেন এবং ক্লাশ শেষ হলে আবার হাতটি ধরে নিরাপত্তার বেষ্টনি দিয়ে সন্তানকে ঘরে নিয়ে যায়। পিতা-মাতার এমন নিষ্ঠা দেখতে খুব ভালো লাগে। পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্য কেউ দায়িত্বশীল খ্রিস্টভক্ত তাদের শিশুদের হাতটি ধরে নিয়ে আসে, এক সঙ্গে বসে এবং ধর্ম শিক্ষা দেন। খ্রিস্টযাগের রীতিগুলি শিশুরা অভিভাবকদের দেখে দেখে শেখে। কচি কচি হাতে হাত রেখে, দুই হাত জোড় করে প্রার্থনা করে। মাথা নত করে প্রণাম জানায়। ধীরে ধীরে হাঁটু ভাজ করে হাঁটু গেড়ে ভক্তি দেখায়। সত্যিই কত ভালো লাগে। কী মনোরম স্বর্গীয় দৃশ্য!

আমাদের শিশু সন্তানেরা আমাদের অনুসরণ করে। আমরা যা করি তারাও তাই করে। আমাদের দেখে দেখে তারা কথা বলতে শেখে, বাবা, মা ডাকে, অন্যদের চেনে, যেভাবে আমরা তাদের পরিচয় করিয়ে দিই সেই ভাবেই তারা জানে, মানে, পরিচিত হয়। তারা আমাদের খেতে দেখে খাবার খেতে শিখে; আমরা যা খাই তারাও তাই খায়, সেই কারণেই জাতি, গোষ্ঠি, কৃষ্টি সংস্কৃতি ভেদে আমরা ভিন্ন খাবারে অভ্যস্থ হই। তারা হামাগুড়ি থেকে উঠে দাঁড়াতে ও হাঁটতে শিখে, কেননা তারা আমাদের হাঁটতে দেখে, সোজা হয়ে চলতে দেখে। সাধারণভাবে ব্যক্তি বিশেষে কিছু একান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া তারা আমাদের মতই হয়ে ওঠে। আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি আচার আচরণ সবই তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মূলত আমরা তাদের শিশুকাল থেকে যে শিক্ষা দেই তারা পরবর্তীতে তাই হয়ে ওঠে।

আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনের শক্ত ভিত গড়ে তুলতে আমরা কত কিছুই না করি। আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব তার কোন কিছু করা থেকে আমরা বিরত থাকি না। বরং আমরা আমাদের সামর্থ্যের চেয়েও বেশী কিছু করার প্রচেষ্টা চালাই। উদ্দেশ্য একটাই যেন আমার সন্তান ভালো মানুষ হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়।

সন্তানকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেমন অতি যত্নের সঙ্গে আমাদের সন্তানদের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেই, একই গুরুত্ব নিয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা বিভিন্ন অজুহাতে তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করি। এর প্রধার কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো আমরা এই শিক্ষাকে (ধর্মীয়) গুরুত্বের সঙ্গে নেই-না। আমাদের সকল শিক্ষার গুরুত্ব ও পরিমাপের মাপ কাঠি হয় পরীক্ষা ও পরীক্ষার নাম্বার। সন্তান ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান বা অন্যান্য বিষয়ে কত নাম্বার পেয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা তার মেধা মূল্যায়ন করি। কোন বিষয়ে কাঙ্খিত নাম্বার না পেলে আলাদা যত্ন করি, প্রাইভেট টিউশন কিংবা কোচিং সেন্টারে পাঠাই। কিন্তু ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা আমরা করি না; বিশেষত পাঠ্য পুস্তকের বাইরে, যেখানে কোন নাম্বার দেওয়া নেওয়ার বিষয় থাকে না। কারণ এর মূল্যায়ন কেউ জিজ্ঞাস করে না, 'বাবু, তুমি ধর্মে কোন গ্রেড পেয়েছো?' কিন্তু এই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রভাব থাকে সারা জীবনে। এখানে প্রাপ্ত নাম্বারে তার মূল্যায়ন হয় না, হয় তার আচার আচরণ মনোভাব, চাল-চলন ও কথাবার্তায়।

আমাদের গির্জাগুলিতে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরুষদের উপস্থিতি বরাবরই কম। রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে যোগদানের অনেকের সুযোগ থাকে না, আবার অনেকে সুযোগ সৃষ্টি করে না, আবার অনেকে সুযোগ গ্রহণ করে না বা সুযোগ হেলায় নষ্ট করে। নারী তথা মায়েদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। তারপরও অনেক মা অজুহাত সৃষ্টি করে গির্জায় যায় না। মা যখন গির্জায় যায় না, তখন সন্তানও যায় না। কারণ মায়ের হাত ধরেই তো সন্তান গির্জায় যায় (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে)।

ধর্মপল্লীগুলিতে যখন প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ, প্রথম পাপস্বীকার বা হস্তার্পণ সংস্কার দেওয়ার প্রস্তুতি চলে, সেই সময় গির্জায় ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে থাকে অনেক অনেক বেশী। কারণ অনেক ক্ষেত্রে তাদের সেই সময় অনেকটা বাধ্য হয়ে গির্জায় আসতে হয়। তাদের বরাবরই জিজ্ঞেস করা হয় কে কে রবিবারে খ্রিস্টযাগে এসেছে? বা কেন আসে নাই। নানাভাবে, নানাজনের কাছে এই সময় জবাবদিহি করতে হয়। তাই তাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে যে, যদি খ্রিস্টযাগে না আসি তা হলে হয়তো বা বাদ পড়ে যাব! কিন্তু যখনই সংস্কার গ্রহণ শেষ হয়, তখন আর তাদের গির্জায় দেখা যায় না। গির্জাঘর ছেলে মেয়ে শূণ্য হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তো এমনও দেখা যায় যে কেউ কেউ প্রথম

পাপস্বীকার/কম্যুনিয়ন নেয়ার পর দ্বিতীয় বার পাপস্বীকার করে হস্তার্পণের সময় আর তৃতীয়বার বিয়ের আগে (সেই সময় অনেকেই পাপস্বীকার পদ্ধতিই ভুলে যায়)। খুবই পরিতাপের বিষয়! একটা বয়সের পর পরিবার থেকে ছেলে-মেয়েদের ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে এবং উপাসনায় যোগদানের ব্যাপারে আর কোন উৎসাহিত করা হয় না। কোন জবাবদিহিতা চাওয়া হয় না। আমাদের শিশু-কিশোর সন্তানদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন তারা গির্জায় আসে না। তাহলে নানা রকম কারণ তারা জানায়। এই সকল কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কয়েকটি কারণ হল, স্কুলে দেরী হয়ে যায়, প্রাইভেট পড়তে যাই, মা নিয়ে আসে না ইত্যাদি। স্কুলের কথা বিবেচনায় রেখে সকল ধর্মপল্লীই খ্রিস্টযাগের সময় সেইভাবেই নির্ধারণ করে অথবা বিকল্প সময়ে একের অধিক খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি কারও অনিহা থাকে, যদি ইচ্ছে করে না আসে তা হলে কি করা যাবে! যদি পিতা-মাতা নানা অজুহাতে খ্রিস্টযাগে না আসেন এবং তাদের সন্তানদের জন্য আসার সুযোগ না করে দেন, তখন কি করার থাকে? যখন তারা ছোটকাল থেকে এই বিষয়গুলি অবহেলা করে, গির্জা আসা, প্রার্থনা করার অভ্যাস গড়ে না তোলেন;, তখন বড় হয়ে তাদের আর কোন আগ্রহ-ই থাকে না, এবং আর কোন কিছুই তারা তখন শিখে না। প্রার্থনা যখন তারা বলতে না পারে, তখন লজ্জায়ই আর গির্জায় বা যে কোন প্রার্থনানুষ্ঠানে যায় না। এরাই যখন পিতা-মাতা হবে, তখন তারা তাদের সন্তানদের আর কোন ধর্মীয় শিক্ষাই দিতে পারবে না। অনেক সময় এই না অংশগ্রহণ করার ধারা শুরু হয় অতি শিশুকাল থেকেই। বলা যায় জন্মের আগে থেকেই; কারণ গর্ভকালীন অবস্থা থেকে অনেক মা, সন্তান যথেষ্ট বড় না হওয়া পর্যন্ত গির্জায় যায় না। গর্ভকালীন অবস্থায় নানা জটিলতা থাকে, শিশুর জন্মের পর চাইলেও যেতে পারে না! কোলের শিশু কান্না করে, গির্জায় দুষ্টামি করে, বিরক্ত করে, অন্যরা বিরক্ত হয়, ক্ষুধা লাগে, আরো কত কি কারণ!

আমাদের অনেক পিতা-মাতা, অভিভাবকেরই অভিযোগ, আমাদের সন্তানরা কথা শোনে না, পড়ালেখা করে না, প্রার্থনা জানেনা! কিন্তু উল্টো সন্তানদেরও একই অভিযোগ-এগুলি আমাদের শিখানো হয়নি। আমাকে বাবা-মা কখনো বলে না-য়। তখন আমরা কি জবাব দিব? তাই সন্তানরা যেন আমাদের বিষয়ে কোন অভিযোগ করতে না পারে, সেই জন্য আমরা যেন আমাদের সন্তানদের শিশুকাল থেকেই শিক্ষা দেই। শিশু বয়সেই যেন আমরা তাদের উপাসনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আসার অভ্যাস গড়ে তুলি। শিশু যদি মায়ের কোলে চড়ে গির্জায় না আসে, মা-বাবার হাত ধরে গির্জায় আসার অভ্যাস গড়ে না তোলে তাহলে বড় হয়ে সে খ্রিস্টযাগে/গির্জায় আসে না। তখন আমরা তাদের যতই বলি তারা তা আর কানে তোলে না। তাদের ভালো লাগে না। কারণ তারা অভ্যস্থ হয়নি, তারা প্রার্থনা জানে না, অন্য সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রার্থনাগুলি বলতে পারে না, তাই তাদের লজ্জা লাগে। তাই আসুন আমরা আমাদের সন্তানদের হাত ধরে গির্জায় নিয়ে আসি। প্রতিটি পরিবার তাদের সন্তানের হাতটি ধরে গির্জায় নিয়ে আসুন, সু-অভ্যাস গড়ে তুলুন॥ ❑

যুদ্ধ ও শান্তি

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

মানুষ সর্বদা শান্তি পিয়াসী। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের কোথাও শান্তি নাই। শান্তিময় জীবনযাপনের জন্য মানুষের মাঝে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য এবং মানবিকতা প্রয়োজন। তাহলে সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যুদ্ধ মানুষের সহজাত শান্তি প্রত্যাশাকে নস্যাৎ করে কলঙ্কিত করেছে ইতিহাসের অনেক অধ্যায়। যুদ্ধের ভয়াবহতা আজও বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। বিধ্বংসী যুদ্ধের ভয়াবহ রূপের সাক্ষী হয়ে আজও পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে আওয়াজ উঠেছে ' যুদ্ধ নয় শান্তি চাই'।

পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধ : যুদ্ধের ইতিহাস অতি প্রাচীন। আদিম যুগে মানুষ খাবার নিয়ে লড়াই করেছে। শিকারের ভাগ একান্ত নিজের করে নিতে বাহুবলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। টিকে থাকার জন্য আদিকাল থেকে মানুষকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ধীরে ধীরে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন হয়েছে। একসময় দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে পরিণতি পায় বিধ্বংসী যুদ্ধ। পৃথিবী এমন অসংখ্য যুদ্ধের সাক্ষী। বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণ, প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি থেকে বহু যুদ্ধের কথা জানা যায়। প্রতিটি যুদ্ধই শেষ হয়েছে ভয়ংকর রক্তপাতের মধ্যদিয়ে। তবে ইতিহাসে এমন কিছু যুদ্ধ এসেছে যেগুলোকে বলা হয় স্বাধিকার অর্জনের যুদ্ধ। যেমন বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

আধুনিক যুদ্ধের রূপ : পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে অতীতেও যুদ্ধ চলেছে এবং বর্তমানেও যুদ্ধ চলছে। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে যুদ্ধের রূপ। অতীতকালে যুদ্ধ হতো মুখোমুখি, তখন যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো তরবারি, বর্শা, তীর, ধনুক ইত্যাদি। এরপর কালের আবর্তনে যুদ্ধে এসব অস্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে। তার স্থান দখল করে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এ আগ্নেয়াস্ত্রে গুলোর তালিকায় প্রথম সংযোজন তোপ বা কামান। তারপর সময়ের সাথে সাথে অস্ত্রেগুলোতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। যুদ্ধের ময়দানে আবির্ভাব ঘটে বন্দুক, গুলি ও বোমা ইত্যাদির। অবশেষে পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে আবিষ্কৃত হয় পরমাণু বোমা যা যুদ্ধের ময়দান তো বটেই পৃথিবীর সার্বিক সামাজিক চরিত্রকেও আমূল পরিবর্তন করে। বর্তমানে যুদ্ধক্ষেত্রে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী ক্ষেপনাস্ত্র, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা চালিত সামরিকযান, মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান ও ড্রোন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যা পূর্বের তুলনায় যুদ্ধকে অনেক বেশি ভয়াবহ করেছে।

বর্তমান বিশ্বে চলমান যুদ্ধঃ একসময় মানুষ যুদ্ধ করত নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য; হিংস্র জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচতে। আর এখন মানুষ যুদ্ধ করে ক্ষমতা প্রকাশ ও নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য। পাশাপাশি অন্যকে ধ্বংস করার জন্য, অন্যের সম্পদ দখল করার জন্য এবং অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য। তাছাড়া সম্প্রসারণশীলতার জন্য ভয়ানক যুদ্ধের উদাহরণ বিশ শতকের ২টি বিশ্বযুদ্ধ। মানুষ হিংসা- দ্বেষ, লোভ-লালসার বশবর্তী হয়েও এখন যুদ্ধ করছে। বর্তমান বিশ্বে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ; ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা শুরু করে। তারপর থেকে দুই পক্ষের আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে নিভে সহস্র প্রাণ। সিরিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত দুই পক্ষ। তাছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ চলছে।

ভয়াবহতা : যুদ্ধের পরিণতি সব সময়ই ভয়ংকর। যুদ্ধ মানেই দুঃখ, কষ্ট আর ধ্বংস। ইতিহাস থেকে জানা যায় ভয়াবহ যুদ্ধের ফলে একের পর এক নগরী নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আধুনিককালে যুদ্ধের ভয়াবহতা কিছুমাত্র কমেনি। যুদ্ধের ভয়াবহতার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায় বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর দু'টি বিশ্বযুদ্ধের কথা। এই দু'টি বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, শত শত শহর জনশূন্য হয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ মানুষের অঙ্গহানি ঘটে; আর সর্বোপরি মানুষের আবিষ্কৃত আধুনিকতম যুদ্ধাস্ত্র পারমানবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে বিশ্ব থেকে দুইটি শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই দুটি বিশ্বযুদ্ধের এমন ভয়াবহতা সত্ত্বে ও মানুষ যুদ্ধের পথ থেকে সরে

আসেনি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো নিজেদের লালসা এবং হীন স্বার্থ চরিত্রার্থ করার উদ্দেশে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে চলমান যুদ্ধের ফলে মারা যায় অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ এবং এখনো প্রতিদিন মারা যাচ্ছে হাজারো আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। এ যুদ্ধ মানবতার জন্য কখনো কোন ধরণের কল্যাণ বয়ে আনেনি এবং ভবিষ্যতেও আনবে না।

ফলাফল: যুদ্ধের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। সংঘর্ষ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বহুকাল ধরে যুদ্ধ চলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি যুদ্ধ একটি দেশকে ১০০ বছরেরও বেশি সময় পিছিয়ে দেয়। একটি যুদ্ধে বহু পরিমাণ অর্থ এবং লোকবল ক্ষয় হয়। যুদ্ধ শুধু বিবাদমান দেশগুলোকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও এর মন্দ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বজুড়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চগতিতে বেড়েছে জ্বালানী তেলের দাম, লাগামহীনভাবে বেড়েছে নিত্যপণ্যের দাম, বেড়েছে গমসহ নানা ভোগ্যপণ্যের এবং সেবার দাম। এমন পরিস্থিতিতে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় দেখা দিয়েছে বৈশ্বিক মন্দা। বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতি।

যুদ্ধ ও শান্তি : শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে যুদ্ধ কখনোই কারো কাম্য হতে পারে না। তবুও বিভিন্ন কারণেই যুদ্ধ ঘটে। কখনো তা দেশের অভ্যান্তরে কখনো বা এক দেশের সাথে আরেক দেশের। শান্তি মানুষের একমাত্র আরাধ্য; শান্তিই শুভ ও মঙ্গলজনক। শান্তি হলো বিশ্বের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয়। একসময় মনে করা হতো শান্তি স্থাপনের জন্য বোধহয় যুদ্ধ করা হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সমাজতত্ত্ববিদরা এ ধারণার অসারতা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেন। তারা দেখিয়েছেন পৃথিবীতে যুদ্ধের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। প্রকারন্তে যুদ্ধ শান্তি তো আনেই না, বরং দীর্ঘকালীন একটি অশান্তির বার্তাবরণ তৈরি করে। তাই শান্তির উপায় হতে পারে পারস্পরিক আলোচনা, সমঝোতা এবং কূটনীতি।

বিশ্বশান্তির গুরুত্ব : বর্তমান সমস্যাসংকূল পৃথিবীতে বিশ্বশান্তির গুরুত্ব অপরিসীম। শান্তি না থাকলে কোন কিছুই সুষ্ঠু, সুন্দররূপে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। জাতীয় নিরাপত্তা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসন এবং বৈশ্বিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় শান্তি স্থাপনের কোন বিকল্প নাই। সকল জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বকে একটি সুন্দর এবং বাসযোগ্য স্থানে পরিণত করাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। পারস্পরিক সহযোগিতা সহানুভূতির মধ্যদিয়ে বিশ্বব্যাপি শান্তির আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে।

বিশ্বশান্তি স্থাপনের উদ্যোগ : ১৯১৪ - ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কেড়ে নেয় প্রায় ২ কোটি মানুষের প্রাণ। পৃথিবীকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্য ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব নেশনস্। এক সময় সংগঠনটির রাজনৈতিক গুরুত্ব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া ২য় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধে বিশ্ববাসী একটি সুসংঘটিত ও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংঘঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বিশ্বব্যপী গণতন্ত্র মানবাধিকার, সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৪ অক্টেবর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান : শান্তিকামী মানুষ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে একই পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। তাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বিশ্বখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবছর বিশেষ ব্যক্তিকে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, রোমাবোঁলা, আঁরি বারবুস, ম্যাক্সিম গোর্কী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমূখ সোচ্চার হন প্রাণঘাতী যুদ্ধের বিরুদ্ধে। শিল্পীর তুলিতে, কবির কবিতায়, গানের সুরে, জীবনের উদ্যমতায় আজ সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছে শান্তির বীজমন্ত্র।

বিশ্বশান্তি দিবস: ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একটি যুদ্ধবিহীন বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাজ্য ও কোস্টারিকার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ অধিবেশন শুরু হওয়ার দিনটিকে "আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস" হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর ৭, ২০০১ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবছর ২১ সেপ্টেম্বর "আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস" হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিশ্বশান্তি ও বাংলাদেশ: বাংলাদেশ সবসময়ই মধ্যপন্থি একটি শান্তিকামী দেশ। জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সবসময় ঐক্য ও শান্তি, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিবাদমান বিশ্বে শান্তি স্থাপনে ছিলেন উৎসাহী। তাই বিশ্বের যেকোন স্থানে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সর্বদা প্রতিবাদমুখর।

মানুষের শান্তির আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। পৃথিবীর মানুষ আজ শান্তি চায়। জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা সত্ত্বেও বিশ্ব থেকে যুদ্ধ নির্মূল হয়নি। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই বৃহৎ শক্তিবর্গের শুভবুদ্ধি। এ শুভবুদ্ধিই সকলের প্রত্যাশা। যুদ্ধনামক এই ধ্বংসযজ্ঞ পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত দূর হয়ে যাক এই হোক আমাদের সকলের প্রত্যাশা॥

তথ্যসূত্র: কারেন্ট আফেয়ার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ॥ ❑

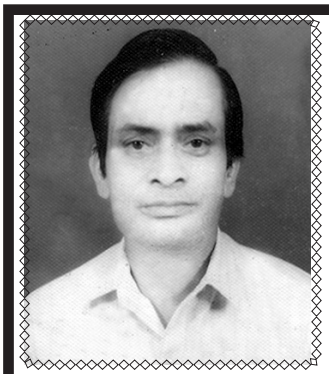

১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত গাব্রিয়েল টমাস পেরেরা

জন্ম : ২০ অক্টোবর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ অক্টোবর, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ
চড়াখোলা (ফড়িং বাড়ি)
তুমিলিয়া মিশন।

'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
তবু আমারে দেব না ভুলিতে'

প্রাণপ্রিয় বাবা,

তোমার স্বর্গধামে যাত্রার আজ সতেরটি বছর পূর্ণ হলো। আমরা ভুলিনি তোমার মুখচ্ছবি জীবনাচরণ, পারা যায়ও না ভুলতে। তুমিই তো আমাদের পৃথিবীর আলোর পথের দিশারী। যেথায় ছিল ঈশ্বরের অসীম ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা যেন আমরা পূর্ণ করতে পারি। এই প্রার্থনায়

তোমার সন্তানেরা ও
স্ত্রী: কর্পুলা পেরেরা

বিজ্ঞ/৩০৭/২৩

অর্থ-লিপ্সাই সকল অনর্থের মূল

হিরণ প্যাট্রিক গমেজ

একটি ছোট শিশু তার বাবার হাত ধরে ঘুরতে বেরিয়েছে। রাস্তায় শিশুটি বেশ কিছু লোকের জটলা দেখলো। সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো ওখানে কি হচ্ছে বাবা?

ওখানে একটা চোরকে পিটাচ্ছে।

শিশুটি তখন তার বাবার কাছে বায়না ধরলো - বাবা, আমি চোর দেখবো । অবশেষে বাবা তাকে চোর দেখতে নিয়ে গেলেন। ভীড় ঠেলে অনেক কষ্ট করে শিশুটি যখন চোরের সামনে গিয়ে পৌঁছালো, তখন অবাক বিস্ময়ে সে বাবাকে বললো চোর কোথায় বাবা, ও তো মানুষ। কর্ম দোষে মানুষ যেমন চোর হয়ে যায় তেমনি মানুষের জীবনকে অর্থবহ কিংবা নিরর্থক করার সাথে যে বিষয়টি জন্মের আগে থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তা হলো "অর্থ"।

আর তাই "অর্থ" কে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে নানা তত্ত্বকথা। অর্থকে কেউ যেমন দ্বিতীয় ঈশ্বর বলে মনে করেন, তেমনি অনেকে মনে করেন অর্থ-ই সকল অনর্থের মূল। বলা হয় "অর্থ ছাড়া জীবন অর্থহীন, কিন্তু অর্থই যেন জীবনের একমাত্র অর্থ না হয়।" তবে অর্থলিপ্সাই যে সকল অনর্থের মূল আপাততঃ সে বিষয়টিতেই আলোকপাত করা যাক।

অর্থ কি?

অর্থ হলো এমন একটি উপাদান যার বিনিময়ে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত পণ্য বা সেবা পেতে পারি। মানুষ তার জীবনে যা কিছু অর্জন করতে চায়, কোন না কোন ভাবে তার সাথে অর্থের সম্পৃক্ততা রয়েছে। অর্থের মূলত চারটি গুণবাচক বিশেষণ রয়েছে অর্থ - টাকা একটি আদান-প্রদান মাধ্যম (Medium), অর্থ - টাকা একটি পরিমাপক (Measure), অর্থ - টাকা একটি মান (Standard) অর্থ-টাকা একটি সঞ্চয় (Store)। কিন্তু যে বিশেষণেই ভূষিত হোক না কেন, এই টাকার সাথে যখন সম্পর্কিত হয়ে যায় মানুষের "লিপ্সা" বা "লোভ" তখনই ঘটতে থাকে যত অনর্থ আর অঘটন ।

লোভ আদি পিতা মাতা, আদম ও হাওয়াকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিল। আদম - হবা থেকে গোট বিশ্ব মানব জাতিতে পরিপূর্ণ হলো। কিন্তু যে "লোভ" দ্বারা প্রতারিত হলো মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ হলো না তার। বরং এই লোভকে পুঁজি করেই শয়তান বা দিয়াবল তার পিছু নিলো। কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাবার লোভ, কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছাবার লোভ, আধিপত্যবাদ থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদের লোভ, এভাবেই লোভের বহুমাত্রিকতা গ্রাস করলো মানুষের বিবেক নৈতিকতা আর মূল্যবোধকে। প্রস্তর যুগের আদিম বর্বরতার মাঝে মানুষ করেছে পশু বিনিময়, সম্পদ বিনিময় বা মানুষ মানুষ বিনিময় আপন লোভে বা স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য, আজকের সভ্য সমাজে সে অবস্থান দখল করে নিয়েছে অর্থ। আর তাই সকল লিপ্সাকে চরিতার্থ করার জন্য অর্থ লিপ্সায় মত্ত মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে সীমাহীন অনর্থের স্তূপের তলায়। এভাবেই সমাজের বিরাজমান অর্থ আর অনর্থের স্তূপ থেকে প্রকৃত মানুষকে তার মানবীয় সত্তার স্খলন ঘটিয়ে। রিপুকে জয় করে ভালবাসা ত্যাগ আর ন্যায্যতার লড়াইয়ে টিকে মানুষগুলোকে সবার আগে যে জিনিসটি বর্জন করতে হয় তা হলো- "অর্থলিপ্সা"। পবিত্র হাদিসে রয়েছে, তিনটি জিনিস দ্বারা পৃথিবীতে মানুষকে পরীক্ষা করা হয় সম্পদ, সম্মান আর সন্তান। পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় অপকর্ম বা অনর্থের পিছনে রয়েছে এই তিনটি বিষয়ের আকর্ষন। অর্থলিপ্সায় মত্ত এক শ্রেণীর মানুষ পৃথিবীতে ধনী হচ্ছে বলেই, আর এক শ্রেণীর মানুষকে মেনে নিতে হয় দারিদ্র। এটা দরিদ্রদের সৃষ্ট নয়, বরং ধনীরা তাদের চারপাশে যে অবস্থা গড়ে তোলে সে অবস্থাই দারিদ্র সৃষ্টি করে এবং তাকে টিকিয়ে রাখেন। আর দারিদ্র হচ্ছে সর্ব কম মানবাধিকারের অস্বীকৃতি। ধনবানের দায়িত্ব কর্তব্যের ন্যায়দণ্ডটি কিন্তু রয়েছে অসহায়, বঞ্চিত, অর্থহীন, দুর্বল মানুষগুলোর হাতে, তাদের প্রতি ন্যায্যতাই শুধু পারে অর্থলিপ্সু মানুষগুলোকে অনর্থের হাত থেকে রক্ষা করতে। যাকাত, দশমাংশ দান ইত্যাদি বিষয়গুলো ধনীর অর্থের গরীবের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; অর্থলিপ্সা যার পরিপন্থী। আর তাই মথি ১৯ অধ্যায় ২৪ পদে বলা হয়েছে ধনী লোকের স্বর্গে প্রবেশ করার চেয়ে বরং একটা সুঁচের ছিদ্র দিয়ে একটি উট প্রবেশ করা সহজ। পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টিকারী অর্থলোভী মানুষগুলোকে একদিকে যেমন তাদের দ্বারা সৃষ্ট অনর্থের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, অন্যদিকে অর্জিত অর্থের উপর গরীবের হিস্যা প্রদানের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

অর্থলিপ্সা মানুষকে প্রকৃত সুখের নামে ক্ষণিক আনন্দ দ্বারা সম্মোহিত করছে, অর্থলিপ্সা মানুষকে বিপদগামীতার দিকে ধাবিত করছে, অর্থলিপ্সা মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসাকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। অর্থলিপ্সার মোহে পড়ে ভাই ভাইকে খুন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কারিতাস ঢাকা অঞ্চলে কাজ করার সুবাদে বস্তি এলাকার অনেক দীন-হীন, হত-দরিদ্র, দুঃখী, অভাবী ও নিঃস্ব মানুষের কাছ থেকে তাদের জীবন অভিজ্ঞতা শোনার সুযোগ হয়েছে। যখন তাদেরকে প্রশ্ন করেছি, ঢাকায় কেন এসেছেন? তাদের বেশির ভাগ মানুষের উত্তর-গ্রামে আমাদের জায়গা-জমি সব অন্যেরা দখল করে নিয়েছে। কারা দখল করে নিয়েছে? উত্তর-আমাদের চাচাতো ভাইয়েরা বা গ্রামের প্রভাবশালী লোকেরা। আর আমাদেরকে বলেছে ওখান থেকে চলে যেতে তা না হলে ওখানে থাকলে তারা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। আমাদের থাকবার বা মাথাগোজার কোন জায়গা নেই তাই ঢাকা চলে এসেছি আর এই বস্তিতে থাকি। সম্পত্তি বা অর্থের লোভ বা লিপ্সা মানুষকে মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করে। কি জানি পশুও হয়তো বা এত খারাপ হতে পারে কিনা? অর্থ লোভ মানুষকে অহংকারী করে তোলে। আর আমরা জানি লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। প্রাচীন দাস প্রথা এখনও আমাদের সমাজে বিদ্যমান রয়েছে, শুধুমাত্র রূপ পাল্টেছে এই আরকি। আমাদের সমাজে একশ্রেণীর মানুষ খুবই ধনী, আবার একশ্রেণীর মানুষ খুবই গরিব আর এই বৈষম্যের মূলে রয়েছে এই অর্থ সম্পদের অসম বন্টণ আর একশ্রেণীর মানুষের অতিরিক্ত অর্থ লিপ্সা।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বৃটিশরা তাদের পুঁজি গঠন শুরু করেছিল জলদস্যুতা দিয়ে, আর তাদের সর্বাধিক মুনাফা এসেছিল দাস ব্যবসা থেকে। লিভারপুল আর ম্যানচেষ্টার ক্ষুদ্র প্রাদেশিক শহর থেকে প্রকাণ্ড নগরীতে পরিণত হয়েছে নিগ্রোদের পরিশ্রম আর কষ্টের বিনিময়ে।

তাই আসুন, ব্যক্তি,পরিবার, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে আমরা লোভকে সংবরণ করি, অনর্থের হাত থেকে নিজে বাঁচি এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ পৃথিবীকে রক্ষা করি॥ ❑

ডেঙ্গু জ্বর ও আমি
জীবন থেকে নেয়া কিছু উপলব্ধি

জে আর এ্যাগ্নেস

জীবন একটা সুযোগ: তাকে আঁকড়ে ধরো। জীবন একটা সৌন্দর্য: তাকে উপভোগ করো। জীবন একটা রঙিন স্বপ্ন: তা বাস্তব করো। জীবন একটা ঝুঁকি: তা গ্রহণ করতে সাহসী হও। জীবন একটা দায়িত্ব: তা পালন করো। জীবন একটা সম্পদ: তা রক্ষা করো। জীবন হলো ভালোবাসার সমুদ্র: তাতে আনন্দ করো। জীবন একটা রহস্য: তা উদ্‌ঘাটন করো। জীবন একটা প্রতিজ্ঞা: তা পূরণ করো। জীবন অনেক বার অসহনীয় কষ্ট: তা জয় করো। জীবন একটা গান: সুমধুর সুরে তা গেয়ে যাও। জীবন সুখের পরশমণি: তা অনুভব করো।

অসুস্থ হয়ে ডেঙ্গু নামক রোগের সাথে যুদ্ধ করতে করতে জীবন নিয়ে ভাবছি আর উপরোক্ত লেখাটা কোনো এক কবির কাব্য ভাবনা যেটি আমার মনে হল সমসাময়িক অবস্থার সাথে বেশ যুক্তি সংগত।

জীবন হল একটি দীর্ঘ যাত্রা যা বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এটি কিছু লোকের জন্য একটি সুন্দর যাত্রা হতে পারে, আবার অন্য কিছু লোকের জন্য এটি একটি ভয়ঙ্কর যাত্রাও হতে পারে। সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল -বেঁচে থাকতেই প্রতিটি মানুষকে জীবন কি তার মূল্য দেওয়া উচিত। কারণ মত্যুর পরে কোনো জীবন থাকতে পারে না।

তাই এক বাক্যে বলতে চাই জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া একটি অতি মূল্যবান উপহার। বেঁচে থাকার মধ্যদিয়েই জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়। মরে গেলেই এই মূল্যায়ন হয় অন্য রকম, ইহজগতের সব সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ, বেদনা, পাওয়া না পাওয়া, ত্যাগ, তিতিক্ষা সব কিছুর মানে জীবন থাকলে যেমন একরকম গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি মৃত্যু হলেই জীবনের কোনো মানে থাকে না। মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ। আত্মা ঈশ্বরের কাছে চলে যাবে। আর দেহ পরে থাকে মাটির ভুবনে। সময়ে সব নিঃশেষ।

তাই জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধির সময় জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। জীবন যখন পেয়েছি তখন নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবতে হবে। আর সেজন্যই নিজের যত্ন নিতে হবে। নিজেকে ভালোবাসতে হবে। কারণ মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে অনেক প্রাণীরই জন্ম হয় কিন্তু সবাই কি জীবন পায়?

তাই জন্ম যদি নিয়েছি এই ধরণী তলে তবে স্বার্থক হোক জন্ম। জন্ম যদি নিয়েছি মনে রাখতে হবে বিভেদ আসবে। পদে পদে প্রকৃতি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে। তারপর অপ্রিয় সত্য মৃত্যুকে বিশ্বাস করতে হবে। আর মৃত্যুই সব কিছুর নিষ্পত্তি।

আমি ডেঙ্গু জ্বরকে সবসময় অবহেলার চোখে দেখেছি। কিন্তু চোখের সামনে যখন জীবন্ত মানুষগুলিকে একে একে চলে যেতে দেখেছি তখন মনের মধ্যে একটা নীরব অনুভূতি আচমকা কামড় কেটে যেত। কেন কেন এমন হয়? কেন এই সামান্য ডেঙ্গু নামক ভাইরাস জ্বরে একজন মানুষ মৃত্যু পথের যাত্রী হবে?

আমি নিজের জীবন দিয়ে যখন উপলব্ধি করেছি এই সামান্য ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহতা কত কঠিন। জীবনের সাথে বেঁচে থাকার লড়াই। তখন এই সত্য উদঘাটন করে মর্মাহত হয়েছি কেন এবং কি কারণে মানুষ অসময়ে সব কিছু ফেলে এত তড়িঘড়ি করে চলে যায় পৃথিবীর সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করে?

আমি আমার উপলব্ধি থেকে সবার কাছে এতটুকু অনুরোধ রেখে বলতে চাই, পরিবারের ছোট বড় যে কারোর এই ডেঙ্গু নামক ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হলে অবহেলা নয় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। নিজে কখনো ডাক্তার হতে যাবেন না। "বাঁচতে হলে খাবার খেতেই হবে।" এই সময় এটা হোক বেঁচে থাকার জন্য একটা স্লোগান। কেউ কোনো কারণে একজন ডেঙ্গু রোগীকে অবহেলার চোখে নয় কিন্তু অতি প্রিয়জন ভেবেই তার সেবাটুকু করুন অর্থাৎ তার যতটুকু পাওয়ার অধিকার এই পৃথিবীতে তাকে তাই দিন। বিশেষ করে ছোটদের ২৪ ঘন্টার প্রতিটা মিনিট তাদের চোখে চোখে রেখে না চাইলেও বার বার লিকুইট খাবার খাওয়াতে হবে। প্লাটিলেট বৃদ্ধি পায় এমন সব খাবার খাওয়াতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষুধ সেবন করাতে হবে।

সবশেষে আবারো বলছি জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া একটি মূল্যবান উপহার। পরিবারের একজনকে হারালে আফসোস ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তার শূন্যতা কতটা অপূরণীয় তা কেবল সেই বুঝে যে হারায়।

বলতে চাই জন্ম ও মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু জন্ম একটি সুন্দর মিথ্যা কাল্পনিক ঘটনা চক্র মাত্র এবং মৃত্যু একটি বেদনাদায়ক সত্য যা আপনাকে সারাজীবন বিশ্বাস করতে হবে॥ ❑

ডেঙ্গু রোধে করণীয়

১) বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে।

২) ঘরের ভেতরে বা বাইরে থাকা ফুলের টব কিংবা ভাঙ্গা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে।

৩) মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত তিন বার স্প্রে বা ফগিং করতে হবে।

৪) মশারি টাঙিয়ে ঘুমাতে যান।

৫) বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশারোধী ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন।

৬) যেখানে সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করতে হবে।

৭) মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে কয়েল ব্যবহার করুন।

৮) এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলায় কামড়ায় তাই ঘুমানোর আগে অবশ্যই মশারি টাঙিয়ে ঘুমান।

৯) ঘরের দরজা, জানালা ও ভেন্টিলেটর মশানিরোধ জাল ব্যবহার করতে পারেন।

১০) বাচ্চাদের স্কুলের ড্রেসে ফুলহাতা শার্ট, ফুলপ্যান্ট ও মোজা ব্যবহার করুন।

১১) তিনদিনের বেশি কোনো অবস্থাতেই পানি জমিয়ে রাখা যাবে না। পরিষ্কার ও স্থবির পানিতে ডেঙ্গুর লার্ভা বেশি জন্মায়।

১২) ফ্রিজ ও এসির নিচে পানি জমে থাকলে তা নিষ্কাশন করুন।

১৩) আপনার আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখলে এবং ছোট ছোট কিছু বিষয়ে সচেতন থাকলে ডেঙ্গুজ্বর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

- তথ্যসূত্র: দৈনিক জনকণ্ঠ

মন আজ ভালো নেই

মাইকেল টুডু

সমাজ, দেশ তথা গোটা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে যুবসমাজ। যাদেরকে ভবিষ্যতের কাণ্ডারী হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তারা মূল্যবান সম্পদ। কাথলিক খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেন-যুবারা ভবিষ্যৎ নয় বরং বর্তমান। কারণ যুবারাই পারে আমাদের সুন্দর একটি পরিবার, সমাজ, দেশ বা সুন্দর একটি বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দিতে। কিন্তু হতাশার আঁধার তাদের জীবনটাকে ঢেকে ফেলেছে, জীবনে সৃষ্টি হয়েছে সমস্যার পাহাড়, চাওয়া-না পাওয়া, বিরহ-ব্যাথা, ব্যর্থতা বা অপূর্ণতা তাদের জীবনকে একেবারে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। যাদের হাতে পৃথিবীর নেতৃত্বের ভার অর্পিত হবে তারা আজ ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্থ। জীবনটা তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। জীবনের স্বাদ তারা হারিয়ে ফেলেছে। তারা জীবনকে আর সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। জীবিত থেকেও যেন মৃত অর্থাৎ জীবন্ত লাশ বললেও ভুল হবে না। কিন্তু কেন? কারণ তাদের মন আজ ভালো নেই। কিন্তু তাদের মন আজ ভালো নেই, এই কথা কি কখনো অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি? উত্তর অবশ্যই না। কারণ জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার বোধশক্তিটা আমাদের অনেক কমে গেছে। জীবনকে আমরা স্রষ্টার দান হিসেবে খুব একটা গুরুত্ব দিই না, মূল্যায়ন করি না, ভালোবাসি না। অর্থহীনভাবে বেঁচে আছি। যাকে সত্যিকার অর্থে বেঁচে থাকা বোঝায় না। তাদের মন ভালো না থাকার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সব কারণ স্বল্প সময়ে বর্ণনা করার মত নয়। এজন্য নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ বর্ণনা করার চেষ্টা করছি।

প্রথমত, জীবনের কোন স্বপ্ন নেই : দেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বলা যায় দেশের অনেক যুবক-যুবতীদের জীবনে কোন স্বপ্ন নেই এ কথা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। অল্প কিছু যুবারা স্বপ্ন দেখে সেটাও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে না পেরে অপমৃত্যু ঘটে। অনেক সময় স্বপ্নগুলোকে লালন করার আগেই শেষ হয়ে যায়। এর পেছনে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অনেক কারণ আছে। যাদের স্বপ্ন থাকে না তাদের জীবন মৃত, অর্থহীন। যার কোন স্বপ্ন নেই তার বেঁচে থাকার কোন অর্থ থাকে না। কারণ স্বপ্ন মানুষকে বেঁচে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। যারা স্বপ্ন দেখতে জানে তারা জীবনে সুখি হতে পারে। স্বপ্ন দেখতে ব্যর্থ সকলেই পরিবার ও সমাজের বোঝা।

দ্বিতীয়ত, অল্পতে হতাশ হওয়াঃ চাওয়া-পাওয়া, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সফলতা-ব্যর্থতা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণই যে জীবন সেটা অনেক সময় তারা ভুলে যায়। আর এজন্য কিছু না পেলে সহজে হতাশার আঁধার তাদের জীবনকে গ্রাস করে ফেলে। জীবনে যে সব কিছুই পেতে হবে সেটা কখনো জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ না। বরং যতটুকুই পাওয়া যাক না কেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে সেটা দিয়ে জীবনকে অর্থবহ করে গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য। তাহলে নিজেরা যেমন ভালো থাকা সম্ভব তেমনই কাছের মানুষগুলোকেও ভালো রাখতে পারা খুব সহজ।

তৃতীয়ত, জীবনে কষ্ট করতে অনিহাঃ বর্তমানে যুবক-যুবতীরা মনে মনে অনেক কিছু আশা করে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম বা কষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা তারা কখনো ভাবে না। অর্থাৎ কষ্ট ছাড়া কেষ্ট চাওয়া বা ধরি মাছ না ছুঁই পানি। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় জীবন তত সহজ নয় যতখানি সহজ মনে হয়। জীবনে কিছু পেতে হলে কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই।

চতুর্থত, নৈতিক জীবনে অধঃপতনঃ নীতিবিদ ম্যুর বলেছেন, "শুভর প্রতি অনুরাগ এবং অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা।" বর্তমান যুব সমাজ দিন দিন নিজেরা জানতে-অজান্তে নিজেদের সুন্দর জীবনকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ধাবিত করছে। আর এর পেছনে অনেকগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ রয়েছে। বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের অপব্যবহার তথা প্রযুক্তির অপব্যবহারই প্রধান দায়ী। প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে মানুষের মাঝখানে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে, সকলে পাশাপাশি থাকছে কিন্তু কাছাকাছি থাকছে না। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে অসহায় হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে আকাশ-সংস্কৃতি যেন তাদের জীবনের অপ্রয়োজনীয় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে সমাজে সংগঠিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূক কর্মকাণ্ড। যা তাদের নৈতিক অধঃপতনের দিকে ধাবিত করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করছে।

পঞ্চমত,অল্প বয়সে নেশার প্রতি আসক্তিঃ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সঙ্গদোষ, বন্ধুদের চাপে, কৌতূহলবশত বা মাদক দ্রব্যের সহজলভ্যতার কারণে অনেকে খুব সহজে নেশার রাজ্যে প্রবেশ করছে কিন্তু সেখান থেকে বের হওয়ার পথ তারা খুঁজে পাচ্ছে না। অনেকের বোধ শক্তিটা এতটাই ক্ষীণ হয়ে গেছে যে তারা আভিজাত্য প্রকাশের জন্যও নেশাগ্রস্থ হচ্ছে অনেক অল্প বয়সে। যা পরিবার, সমাজ তথা দেশে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। কারণ তার ফলে পরিবার বা সমাজে অরাজকতামূলক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে, প্রতিবেশিদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। কারণ মাদক হচ্ছে সব ধরনের অরাজকতামূলক পরিস্থিতি এবং অরাজকতামূলক কর্মকাণ্ডের জননী। মাদকের প্রতিযোগিতায় গ্রামের তুলনায় শহরের মানুষ অনেক ধাপ এগিয়ে আছে। কেননা শহরে যেসব মাদকদ্রব্যের প্রচলন আছে তা গ্রামের মানুষের দেখা তো দূরের কথা অনেকে নাম পর্যন্তও শোনে নি।

ষষ্ঠত, পারিবারিক সমস্যা : দৈনন্দিন জীবনযাপনে সমস্যা ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। তবে সমস্যা যেমন আছে তেমনই সমস্যার সমাধানও আছে। অর্থাৎ পরিবারে সমস্যা থাকবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু না। যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে সমাজে সম্পদের অসম বন্টন রয়েছে। যার ফলে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নিত্যসঙ্গী হচ্ছে অভাব অনটন। এজন্য পরিবারে মা বাবা এবং সন্তানদের মধ্যে অনেক সময় অশান্তি কাজ করে। তাছাড়াও মা বাবার মধ্যে সর্বদা লেগে থাকা ঝগড়া -বিবাদ,ভুল - বোঝাবুঝি, পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আস্থার অভাব পারিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি করে। এছাড়াও মা বাবার বহুবিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ সন্তানের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম। বন্ধু বান্ধবদের সাথে চলাফেরার সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। তখন সন্তানেরা একাকিত্ব অনুভব করে। বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সুস্থ এবং সুন্দর পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয়।

সপ্তমত, একজন ভালো বন্ধুর অভাবঃজীবন পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একজন ভাল বন্ধুর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা একজন ভালো বন্ধু হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার মহামূল্যবান দান, এক মহা ঔষধ। একজন ভালো বন্ধু জীবনকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে সাহায্য করে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় একজন ভালো বন্ধু পাওয়া দুর্লভ। সুখ- দুঃখের দিনে মনের কথা বলার মত মানুষের বড়ই অভাব। এমনও অনেকে আছে যাদের দুঃখের কথা শোনার কেউ নেই। ভার্চুয়াল বন্ধুর অভাব নেই এটা যেমন সত্য তেমনি বিপদের দিনে কাউকে খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে এটাও কোন মিথ্যা কথা নয়। এজন্য মানুষ আজ বড় একা হয়ে যাচ্ছে। এজন্য জীবনে একজন ভালো বন্ধু রাখা খুব প্রয়োজন।

অষ্টমত, ধর্মের প্রতি অনিহাঃ দিন দিন যুবক-যুবতীরা ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড অনিহা প্রকাশ করছে, তারা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য নয়, ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অযথা তর্কে জড়িয়ে পড়ছে। তারা ভুলে যাচ্ছে ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার। যার ফলে তারা মানসিক প্রশান্তি অনুভব করতে পারে না। মনের মধ্যে থাকা চঞ্চলতা তাকে সারাক্ষণ অস্থির করে তোলে। সুখ-শান্তি, সফলতা, সমৃদ্ধি সবই স্রষ্টার কাছ থেকে আসে। একমাত্র স্রষ্টাই তাঁর সমস্ত সৃষ্টির সুখ ও শান্তির উৎস, তিনিই একমাত্র পরম সুখের ভরসাস্থল।

তাই এখন নিজেদের সচেতন করা এবং যা কিছু আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। আর এজন্য সকলকে পারস্পরিক যোগাযোগের বন্ধন আরো বেশি দৃঢ় করতে হবে। কেননা একটা সম্পর্কের জন্য যোগাযোগ হচ্ছে মেরুদণ্ড। যোগাযোগ ছাড়া কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। জীবন সংগ্রামে টিকিয়ে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখার বা জানার আগ্রহ থাকতে হবে। তাহলে সেখান থেকে নানা ধরনের জীবন পরিচালনার কৌশল আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। যা জীবনকে অর্থবহ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। আর এজন্য অবশ্যই প্রাণবন্ত এবং সক্রিয় হতে হবে। তাহলেই মন ভালো থাকবে। মন ভালো থাকলেই নিজেকে ভালোবাসা সম্ভব হবে। আর নিজেকে ভালোবাসতে পারলে আশেপাশের প্রিয়জনদের ভালোবাসা যাবে, ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসা যাবে, জীবনটা ভালোবাসাময় করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে॥

জীবনের গল্প-১৬

নজরুলের গান ও একটি অসমাপ্ত প্রেমকাহিনী

খোকন কোড়ায়া

লেখালেখি করবো এরকম কোন ইচ্ছে বা স্বপ্ন ছোটবেলায় আমার ছিলো না। তখন স্বপ্ন ছিলো গায়ক হবো, বাদক হবো। গ্রামের বড় ভাই যারা হারমোনিয়াম, তবলা বাজাতে পারতো, তাদের সহায়তায় কয়েক মাসের মধ্যেই হারমোনিয়াম এবং তবলা বাজানোটা শিখে ফেললাম চলনসইভাবে। পরে অবশ্য খোল বাজানোও শিখেছিলাম। ছোটবেলা থেকেই কাজী নজরুল ইসলামের গান আমাকে খুব টানতো। সবচেয়ে ভালো লাগতো তার গানের কথাগুলো। হারমোনিয়ামে প্রথম গানটাও তুললাম নজরুলের "কোথা চাঁদ আমার, নিখিল ভূবন মোর ঘিরিল আঁধার, কোথা চাঁদ আমার।" এই গানটা এখন অবশ্য খুব বেশি শোনা যায় না। চাঁদ তারা নিয়ে নজরুলের আরো অনেকগুলি গান আমার প্রিয়। তার মধ্যে দুটি গান হলো "মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, দেবো খোপায় তারার ফুল" এবং "তোমার আঁখির মত, আকাশের দুটি তারা।" কথাগুলো কি সুন্দর, কি চমৎকার তুলনা! এসএসসি পাশ করার পর ময়মনসিংহ শহরে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হলাম, পাশাপাশি ভর্তি হলাম নজরুল একাডেমিতে, গান শেখার জন্য। সেখানেও আমাকে প্রথম শেখানো হল একটি নজরুলগীতি এবং চাঁদ নিয়ে "একাদশীর চাঁদরে ঐ রাঙ্গা মেঘের পাশে, যেন কাহার ভাঙ্গা কলস আকাশ গাঙ্গে ভাসে...।" আহা কি সুন্দর উপমা!

কবিতা লেখার মধ্যদিয়ে লেখালেখির শুরু তখন থেকেই। আর কি আশ্চর্য কেন জানি না তখন থেকেই সঙ্গীত চর্চায় ভাটা শুরু হলো আমার। তবে সেটা এতো ধীরে যে আমি নিজেও বুঝতে পারিনি। কয়েক বছর পর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, আমি আর গান করছি না। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ঢাকায় চলে এলাম। তারপর তেজগাঁও কলেজ থেকে বি.কম পাশ করে চাকরিতে ঢুকলাম। থাকি রাজাবাজারের একটা মেসে। এই মেসে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও থাকে, ওর নাম বিজন। সুজন নামে বিজনের এক বন্ধু মাঝে মাঝে মেসে আসে আড্ডা দিতে। ছেলেটি বেশ লম্বা, পেটানো শরীর। গায়ের রং কালো। সুজনকে না দেখলে আমার জানা হতো না, একজন কালো মানুষও এতটা সুন্দর, হ্যাণ্ডসাম হতে পারে। খুব ফূর্তিবাজ এবং মুডি ছেলে সুজন। যতক্ষণ মেসে থাকে সবাইকে মাতিয়ে রাখে।

সবাই বলে সুজন একজন বড় মাস্তান। তবে বিজন বললো, মাস্তান বলতে আমরা যা বুঝি, যেমন চাঁদাবাজি করা, খুন খারাপি করা এসব কিছুই সুজন করে না। অবশ্য টপ টেররদের সঙ্গে সুজনের যোগাযোগ আছে, বন্ধুত্ব আছে। নিজেও অসীম সাহসী। সন্ত্রাসী হোক, নেতা হোক আর পুলিশ হোক, কাউকে তোয়াক্কা করে না সুজন। এমনিতে কারো গায়ে হাত তোলে না, তবে ওকে চটালে মেরে তার জিওগ্রাফি পাল্টে দেয়। সুজন চাঁদাবাজি করে না কিন্তু কেউ চাঁদাবাজির শিকার হয়ে ওর সাহায্য চাইলে তাকে রক্ষা করে, কারো দামি জিনিস ছিনতাই হলে তা ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় সুজন। আমার সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায় সুজনের। আমরা তখন "আমলকী" নামে চার/ছয় লাইনের কবিতার একটি ছোট পত্রিকা বের করতাম, সেটারও ভক্ত হয়ে যায় সুজন। প্রতি রোববার সন্ধ্যায় বিজনকে নিয়ে কোথায় যেন যায় সুজন। ভাবছিলাম বিজনকে জিজ্ঞেস করবো ওরা কোথায় যায়, তার আগেই এক রোববার সুজন বললো, খোকন তুমিও চল আমাদের সঙ্গে। বললাম, কোথায়?

- কাঁঠালবাগান, গান শুনতে, নজরুলগীতি। তুমিতো তবলা বাজাতে পার, তবলা থাকলে গান জমবে ভালো।

টিনশেডের একটি ছোট বাসা। একটি মধ্যবিত্ত পরিবার বাস করে। স্বামী-স্ত্রী, এক ছেলে এক মেয়ে, ছেলের বয়স তের/চৌদ্দ, মেয়ের উনিশ/বিশ। মেয়েটিই গান করে, নাম পূর্ণিমা। গৃহকর্তা এবং গৃহকর্তী দুজনই দেখলাম সুজনকে খুব স্নেহ করে, মনে হলো একটু সমীহও করে। পূর্ণিমাকে কিছু বলতে হলো না, হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেলো। সুজন বললো তবলা আন, আমার বন্ধুকে এনেছি ও তবলা বাজাতে পারে। গান ধরলো পূর্ণিমা, "একেলা গৌরি, জলকে চলে গঙ্গাতীর, অঙ্গে...।" সুরেলা কণ্ঠ। বোঝা যায় চর্চা আছে। প্রায় নিখুঁতভাবেই গাইলো গানটি। এরপর নজরুলের কয়েকটি গজল গাইলো এবং শেষে আবারও "একেলা গৌরি" শুনতে চাইলো সুজন। পূর্ণিমা মেয়েটি খুব ফর্সা নয়, তবে মুখের আদলটি প্রতিমার মত, চোখ দুটি খুব জীবন্ত। হাসে কম কিন্তু যখন হাসে সেটা দেখার মত।

মেসে এসে বিজন বললো, পাড়ার ইভটিজাররা পূর্ণিমাকে এতটাই বিরক্ত করতো যে ওর কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। পূর্ণিমার বাবা তার এক আত্মীয়ের কাছে সুজনের কথা জানতে পারে এবং সুজনের কাছে সাহায্য চায়। একদিন সন্ধ্যায় সবগুলি ইভটিজারকে নিয়ে পূর্ণিমাদের বাসায় আসে সুজন, সঙ্গে ছিলো পাড়ার এক বড় ভাই। সবগুলিকে মাফ চাওয়ায় এবং প্রতিজ্ঞা করায় আর কোনদিন পূর্ণিমাকে বিরক্ত করবে না।

বেশ কয়েকদিন বিজন সুজনের সঙ্গে পূর্ণিমাদের বাসায় গেলাম। প্রতিদিনই নজরুলের গানই শোনালো পূর্ণিমা। তবে কোনদিনই "একেলা গৌরি" গানটি বাদ পড়লো না কারণ গানটি সুজনের খুব প্রিয়। পূর্ণিমার সঙ্গে সুজনের খুব বেশি কথা হতো না, তবে দু'জন দু'জনের দিকে যেভাবে তাকাতো তাতে আমার মনে হয়েছে ওরা ভালোবাসে। বিজনকে জিজ্ঞেস করায় ও বললো, সত্যি ভালোবাসে ওরা দু'জন দু'জনকে। বললাম, কিন্তু সুজন কি পূর্ণিমাকে বলেছে কথাটা।

- না, বলেনি।
- কেন?
- সুজন বলে, যাকে বোন ডেকেছি, তাকে এটা বলতে পারবো না, তাছাড়া ওরা ভাবতে পারে আমি সুযোগ নিচ্ছি।
- পূর্ণিমাওতো বলতে পারে সুজনকে।
- পূর্ণিমাও বলতে পারবে না কারণ ও সুজনকে যতটা ভালোবাসে তার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে।

মেস ছেড়ে একটি পরিবারের সঙ্গে এক রুম সাবরেন্ট নিয়েছি। সামনে আমার বিয়ে, তারই প্রস্তুতি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। মেসের কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই অনেকদিন। তখনতো আর সেলফোন ছিলো না, তাই সশরীরে দেখা করা ছাড়া যোগাযোগের আর কোন উপায় ছিলো না। বছরখানেক পর রাস্তায় বিজনের সঙ্গে দেখা। বললো, খবর জানো কিছু?

- কিসের খবর?
- সুজন খুব অসুস্থ, দুটো কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে, মনে হয় বেশিদিন বাঁচবে না।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। বললাম, পূর্ণিমার খবর কি?

- পূর্ণিমার বিয়ে হয়েছে, স্বামীর সঙ্গে খুলনা থাকে।

ভাবতেছিলাম সুজনকে দেখতে যাবো রোববার। শনিবার খবর পেলাম, গতকাল সুজন মারা গেছে এবং কবরও দেয়া হয়ে গেছে। সুজনের ছোট ভাই অনেক চেষ্টা করেও খবরটা আমাদের পৌঁছাতে পারেনি।

পরদিন বিজনের সঙ্গে সুজনদের গ্রামে গেলাম। সুজনের কবরে ফুল দেয়ার সময় হঠাৎ গানটা মনে এলো, আর আমি মনে মনে গাইতে লাগলাম "একেলা গৌরি, জলকে চলে গঙ্গাতীর, অঙ্গে ঢুলিয়া পড়ে, লালসে অলস সমীর।" ❑

আলোচিত সংবাদ

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে আবারও জোর যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আগামী জাতীয় নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়, সে বিষয়ে আবারও জোর দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। এ সময় তিনি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়, তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় অনুযায়ী ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুরে ওই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের আলোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে জন কারবি বলেন, তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়ন নিয়েও তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

দুদকের মামলায় ড. ইউনূসসহ ১৩ জনকে তলব

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৩ জনকে তলব করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ড. ইউনূসকে দুদকে হাজির হতে বলা হয়েছে।

দুদকের উপপরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধান স্বাক্ষরিত চিঠিতে ড. ইউনূসকে তলব করা হয়েছে। চিঠিটি দেওয়া হয় গত ২৭ সেপ্টেম্বর।

ড. ইউনূস গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান। গত ৩০ মে গ্রামীণ টেলিকম থেকে শ্রমিক-কর্মচারীদের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলাটি করেন দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার।

মামলায় অন্য আসামিরা হলেন গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান, পাঁচ পরিচালক পারভীন মাহমুদ, নাজনীন সুলতানা, মো. শাহজাহান, নূরজাহান বেগম ও এস এম হাজ্জাতুল ইসলাম লতিফী, আইনজীবী মো. ইউসুফ আলী ও জাফরুল হাসান শরীফ, গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ মাহমুদ হাসান, গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধি মো. মাইনুল ইসলাম।

এবার অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটালে রেহাই নেই: প্রধানমন্ত্রী

আন্দোলনের নামে নাশকতার চেষ্টা করে কেউ রেহাই পাবে না বলে হুশিয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আন্দোলনের নামে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ২০১৩-১৪ সালের মতো অগ্নিসংযোগ এবং অমানবিক নৃশংসতার মতো ঘটনা ঘটলে কোনো সহনশীলতা দেখানো হবে না।

সোমবার লন্ডনের মেথোডিস্ট সেন্ট্রাল হল ওয়েস্টমিনস্টারে তার সম্মানে আয়োজিত একটি কমিউনিটির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজেদুর রহমান ফারুক।

জাতিসংঘের অধিবেশন শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ১৬ দিনের সরকারি সফর শেষে বুধবার ঢাকায় ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী ৩০ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি বিমানে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে পৌঁছান। লন্ডনে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত শেখ হাসিনা বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে দেওয়া এক সংবর্ধনায় যোগদেন এবং বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গা বিষয়ে গঠিত এপিপিজি'র সভাপতি এবং যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা বিষয়ক ছায়ামন্ত্রী রুশনারা আলী এমপির নেতৃত্বে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের (এপিপিজি) এক প্রতিনিধিদলসহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্টজন তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

নিউ ইয়র্কে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী ১৭-২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৮তম অধিবেশন এবং এর ফাঁকে অন্যান্য উচ্চ-পর্যায়ের ও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

ওয়াশিংটন ডিসিতে শেখ হাসিনা ২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন করেন।

ভারতের বিরুদ্ধে কানাডার অভিযোগ 'গুরুতর': যুক্তরাষ্ট্র

খালিস্তানপন্থি শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার ঘটনায় ভারত সরকারের জড়িত থাকার বিষয়ে কানাডা যে অভিযোগ তুলেছে, তাকে 'গুরুতর' বলে অভিহিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলেও মনে করে ওয়াশিংটন।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশনের কো-অর্ডিনেটর জন কিরবি এমন কথা বলেছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন কিরবি।

বুধবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, খালিস্তানপন্থি নেতার হত্যায় ভারতের জড়িত থাকার বিষয়ে কানাডার তোলা অভিযোগ 'গুরুতর' এবং এটি পরিপূর্ণভাবে তদন্ত করা দরকার।

কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের একটি শিখ মন্দিরের বাইরে গত ১৮ জুন গুলি করে হত্যা করা হয় ৪৫ বছর বয়সী হরদীপ সিং নিজ্জারকে। তিনি ছিলেন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা এবং কানাডিয়ান নাগরিক।

হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যায় ভারতীয় সরকারের এজেন্টদের ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ করেন কানাডীয় প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, কানাডার গোয়েন্দা সংস্থা শিখ নেতা নিজ্জারের হত্যার সাথে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার 'বিশ্বাসযোগ্য' প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে।

ট্রুডোর এমন অভিযোগের পর ভারত ও কানাডার মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যদিও হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগকে 'অযৌক্তিক' বলে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। নিহত নিজ্জার নয়াদিল্লির চোখে 'সন্ত্রাসী' ছিল।

এদিকে শিখ নেতা হত্যার ইস্যুতে অটোয়া ও নয়াদিল্লির মধ্যে উত্তপ্ত সম্পর্কের মধ্যেই ভারত সরকার আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে কানাডাকে ৪১ কূটনীতিক সরিয়ে নিতে বলেছে॥ ❑

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন, আমাদের সময়, প্রথম আলো, যুগান্তর

দয়া এবং দয়ার প্রতিদান

দর্শন চাম্বুগং

একটি গ্রামে এক ছেলে ছিল। তাদের গ্রামের সবাই খুব গরীব ছিল। তাদের এক বেলার আহার যোগাতেই খুব পরিশ্রম করতে হত। তাদের তেমন কোন কাজকর্ম ছিল না, তাই কাজের সন্ধানে ঘুরে বেরাতে হত। একদিন ছেলেটি তার পড়াশুনা ও পরিবারের খরচ চালাতে ফেরিওয়ালার মত ছোটদের খেলনা বিক্রি করতে শুরু করল। একদিন তার খুব ক্ষুধা পেল এবং জিনিস বিক্রির টাকা দিয়ে কিছু খাবার কিনতে চাইল কিন্তু আশেপাশে কোন দোকান ছিল না। সে চিন্তা করল বাড়ি বাড়ি জিনিস বিক্রি করে তাদের কাছে কিছু খাবার চাইবে। ঘুরতে ঘুরতে সে একটি বাড়িতে গেল। খাবার চাইবার আগেই সেই বাড়ি থেকে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে দরজা খুলে বেড়িয়ে এল। তখন সে খাবার চাইবার সাহস হারিয়ে ফেলল। সে মেয়েটির কাছে এক গ্লাস জল খেতে চাইল। মেয়েটি তার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারল যে, ছেলেটি খুবই ক্ষুধার্ত। তাই সে তাকে বড় একটি গ্লাসে করে দুধ এনে দিল। দুধ খাওয়ার পর ছেলেটি তাকে জিজ্ঞেস করল, এর জন্য তাকে কত টাকা দিতে হবে? মেয়েটি উত্তর দিল, এর জন্য তাকে কিছুই দিতে হবে না। আমার মা শিখিয়েছেন যে, কোন দয়ামূলক কাজের জন্য টাকা নিতে নেই। ছেলেটি বলল, তাহলে আমি আমার হৃদয় থেকে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ছেলেটি শরীরে শক্তি অনুভব করল এবং ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হল। তারপর সে বাড়ি ফিরে গেল।

বহু বছর পর ছেলেটি নাম করা বড় ডাক্তার হল। তখন সেই সুন্দরী মেয়েটি মহিলা। তখন সেই মহিলাটি একটি জটিল রোগে আক্রান্ত হল। স্থানীয় ডাক্তাররা তাকে বড় শহরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানের পারদর্শী ডাক্তাররা বিরল রোগটি নিয়ে আলোচনায় বসলেন। অবশেষে ডাক্তাররা সেই ছেলেটির শরনাপন্ন হলেন, যে ফেরিওয়ালার কাজ করত। সে যখল মহিলাটির শহরের নাম শুনলেন তখন তার চোখদু'টি উজ্জল হয়ে উঠল। তখন সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে ডাক্তারের পোশাক পরে হাসপতালের নিচের তলায় সেই মহিলাটির রুমে ছুটে গেলেন। তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। তক্ষুনি তিনি আলোচনা কক্ষে ফিরে এলেন আর ঠিক করলেন যেমন করেই হোক নিজের দক্ষতা দিয়ে মহিলাটির প্রাণ রক্ষা করবেন। তিনি মহিলাটির চিকিৎসা করলেন এবং চিকিৎসায় সফল হলেন। মহিলাটি সুস্থ হল।

পেমেন্ট কাউন্টারে তিনি অনুরোধ করলেন যেন মহিলার বিলটি আগে তার কাছে পাঠানো হয়। তিনি বিলটি দেখলেন এবং তাতে কিছু লিখে সেই মহিলার কাছে পাঠালেন। মহিলাটি বিলের কাগজ হাতে পেয়ে ভাবলেন, তার হয়তো অনেক বিল হয়েছে যা মেটাতে তার সমস্ত পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। তিনি ধীরে ধীরে বিলের কাগজটি খুলে পড়লেন এবং লক্ষ্য করলেন শেষের দিকে অন্য কিছু লেখা আছে। তাতে লেখা, ''আমি সেই ছেলেটি, যাকে তুমি এক গ্লাস দুধ দিয়েছিলে। তার বিনিময়ে এই বিলটি সম্পূর্ণ মেটানো হল।" নিচে সাক্ষর ছিল ডাঃ ডেনিস।

আনন্দে সেই মহিলাটির দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তার আনন্দপূর্ণ হৃদয় এই প্রার্থনা জানাল, "ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার ভালোবাসা মানুষের হৃদয়ে ও হাতের মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে পরছে।"আর আমি তোমার দয়া-দয়ার প্রতিদান পেয়েছি। তাই ঈশ্বর, তোমার দয়া অসীম॥ ❑

বিশ্ব শিক্ষক দিবস

এ্যাড. এ. কে. এম. নাসির উদ্দীন

এবার থেকে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর রাষ্ট্রীয়ভাবে
শিক্ষক দিবস পালিত হচ্ছে
বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ তাই আনন্দের জোয়ারে ভাসছে।
"বিশ্ব শিক্ষক দিবস" রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের জন্য শিক্ষকদের
অনেক দিনের আশা ছিল
বর্তমান সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে
সে আশা পূর্ণ করে দিল।
গুণীজন শিক্ষকদের এ দিবসে সংবর্ধনা দেওয়া হবে
শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে।
সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এ বছর থেকেই "বিশ্ব
শিক্ষক দিবস'' পালিত হবে
বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতে এ দিবস পালনের মাধ্যমে
শিক্ষকগণ আরও বেশি
উপকৃত হবে।
বাংলাদেশের জনগণ রেডিও, টিভিতে "বিশ্ব শিক্ষক দিবসের"
অনুষ্ঠান শুনবে ও দেখবে
সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে "বিশ্ব শিক্ষক
দিবস" পালিত হচ্ছে
জনগণ সেটা বুঝবে।
জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে
এ দিবস পালন করা হচ্ছে
বহুদিনের চাওয়া পাওয়া, দাবি-দাওয়ার বিষয়গুলো
শিক্ষকদের মনে আসছে।
বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ
জাতীয়করণ করেছিলেন
বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা অবশিষ্ট বেসরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করে দিলেন।
"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" এ কথাই যদি সত্যি হয়
শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর
জেনে রাখুন নিশ্চয়ই।
ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ার কারিগরদের যদি সঠিকভাবে
মূল্যায়ন করা না হয়
সবে জেনে রাখুন শিক্ষাক্ষেত্রে একদিন নেমে
আসবে পরাজয়।
মেধাবীদের অবশ্যই শিক্ষকতা পেশায় আশার সুযোগ করে
দিতে হবে
মেধাবীরা শিক্ষক হলেই কেবল আগামী প্রজন্ম মেধাবী হবে।
পুষ্টির অভাবে একটি জাতি রুগ্ন হয়, শিক্ষার অভাবে একটি
জাতি মারা যায়
শিক্ষকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মূল্যায়ন করা না হলে
জাতির উন্নতি কি আশা করা যায়?
আসুন সবে মিলে "বিশ্ব শিক্ষক দিবসে"
এ প্রত্যাশাই করি
শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন করে
"স্মার্ট বাংলাদেশ" গড়ি॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ঈশ্বর সিনড/মহাসভাকে ‘শ্রবণশক্তি উপহার’ হিসেবে দান করুন: সিনড শুরুর পূর্বসন্ধ্যাতে পোপ মহোদয়

সিনডের তাৎক্ষণিক পূর্বপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে পূর্বদিনের সন্ধ্যায় সাধু পিতরের চত্বরে হাজারো তীর্থযাত্রী আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানে সমবেত হয়। বিভিন্ন মণ্ডলী প্রধানগণ সিনডকে প্রেরিতদের কার্যাবলী গ্রন্থের জেরুশালেমে সাধু পিতরের বক্তব্য দানের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, পিতরের বক্তব্যের পর সমবেত সকলে নীরব হয়ে রইলো। এটা আমাদের স্মরণ করায় যে, নীরবতা মাণ্ডলিক সমাজে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ যোগাযোগ সম্ভব করে তোলে; আমরা যখন অন্যদের কথা শোনার জন্য নীরব থাকি শুধু তখনই পবিত্র আত্মা সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি দান করেন। তদুপরি, মানুষের মধ্যে প্রায়শই লুকায়িত ও প্রতিধ্বনিত পবিত্র আত্মায় দীর্ঘশ্বাস মনোযোগ সহকারে শোনে নীরবতা সত্যিকার আত্ম-অবধারণে সক্ষম করে তোলে। তাই পোপ ফ্রান্সিস সাধু পিতরের চত্বরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত করেন যেন তারা সিনডে অংশগ্রহণকারীদের জন্য পবিত্র আত্মাকে অনুরোধ করেন তাদের জন্য শ্রবণশক্তি উপহার হিসেবে দান করেন।

সাধু পিতরের চত্বরে আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনায় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও অন্যান্য মণ্ডলীর প্রতিনিধিবর্গ (৩০/০৯/২৩)

কেন্দ্র করে সেখানে মিলিত হন। সন্ধ্যা প্রার্থনার শেষের দিকে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় নীরবতা শিরোনামে বিশেষভাবে এখনকার সময়ে খ্রিস্টানদের জন্য নীরবতার তিনটি মূল্যবোধের উপর জোর দিয়ে অনুধ্যান রাখেন।

নীরবতা ও ঈশ্বরের কণ্ঠ: যিশুর জাগতিক জীবনে শুরু ও সমাপ্তিতে নীরবতার উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। জন্মোৎসবের রাতে ঈশ্বরের বাক্য নীরবতায় যাবপাত্রে এবং যন্ত্রণাভোগের সেই রাতে ক্রুশের উপরে নীরব যিশু। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর মনে হয় চিৎকার, গপ্পো ও গোলমাল থেকে নীরবতাকেই বেশি পছন্দ করেন। যখন তিনি প্রবক্তা এলিয়ের কাছে আবির্ভূত হলেন তখন তিনি ঝড়ো বাতাস, ভূমিকম্প বা আগুনের মাধ্যমে আসেননি কিন্তু উপস্থিত হয়েছেন মৃদু স্বরে। তাই পুণ্যপিতা বলেন, মানুষের হৃদয়ে পৌঁছানোর জন্য উচ্চ চিৎকারের প্রয়োজন নেই। বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে আমাদেরকে কোলাহল থেকে মুক্ত হতে হবে। কেননা আমাদের নীরবতার মধ্যেই ঈশ্বরের স্বর ধ্বনিত হয়।

নীরবতা ও মণ্ডলীর জীবন: পুণ্যপিতা ***নীরবতা ও খ্রিস্টীয় ঐক্য:*** পোপ বলেন, নীরবতার চূড়ান্ত একটি দিক হলো এটি খ্রিস্টীয় ঐক্যের যাত্রার জন্য অপরিহার্য। কেননা নীরবতা হলো প্রার্থনার মৌলিক ধাপ। আর আন্তঃমাণ্ডলিকতা শুরুই হয় প্রার্থনার মাধ্যমে এবং প্রার্থনা ছাড়া তা বন্ধ্যা। তাই আমরা প্রার্থনাতে যতবেশি প্রভুর দিকে ফিরি তত বেশি অনুভব করি যে, প্রভু আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করছেন এবং আমাদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একত্রিত করছেন।

পোপ মহোদয় প্রার্থনা দিয়ে তাঁর উপদেশীয় বক্তব্য শেষ করেন: এসো আমরা আবার নীরব হতে শিখি যাতে করে পিতার সুর, পুত্রের আহ্বান ও পবিত্র আত্মার ক্রন্দন শুনতে পাই। এসো প্রার্থনা করি যেন সিনড-ই ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সঠিক সময় হয় এবং যার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে সমস্ত গুজব, ধারণা ও বহুবিদ মেরুকরণ থেকে পরিশুদ্ধ করুন। আমরা যেন পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের মতো জানতে পারি কিভাবে একতায় ও নীরবতায় ঈশ্বরপুত্রকে পূজা করতে হয় এবং পরস্পরের আরো বেশি সংযুক্ত হতে হয়।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের মূলসুর প্রকাশ

‘পূর্ণাঙ্গ মানবীয় যোগাযোগের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়ের জ্ঞান’ বিষয়টিকে ৫৮তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে ২৯ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। এ বিষয়টি প্রকাশ কল্পে ভাতিকানের প্রেস অফিস জানায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার বিবর্তন যন্ত্রের সাথে ও যন্ত্রের মাধ্যমে যোগাযোগকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। যার দরুণ, চিন্তা থেকে গণণা ও যন্ত্রের উৎপন্ন ভাষা ও মানুষের সৃষ্ট ভাষার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ছে। অন্যান্য বিপ্লবের মতো এই বিপ্লবটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর ভিত্তি করে; যা নতুন চ্যালেঞ্জ দান করে যে মেশিনগুলো বৃহৎ বিভ্রান্তিমূলক সিস্টেমে অবদান রাখবে না বা যারা ইতোমধ্যে একাকী তাদের একাকীত্ব বাড়াবে না বরং মানবীয় যোগাযোগের যে উষ্ণতা তা থেকে বঞ্চিত করবে না তার নিশ্চয়তা দিবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। যাতে করে প্রত্যেকজন ব্যক্তিই যোগাযোগের বিভিন্ন ধরণ যা হাতে হাত রেখে চলে তা যথার্থ ও দায়িত্বশীলভাবে পরিচালনা করতে পারে।

মার্সাই সফর শেষে রোমে ফিরে পোপ মহোদয়

৪৪তম পৈরিতিক সফর শেষে পোপ মহোদয় ভাতিকানে ফিরে এসে ধন্যা মারীয়াকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। রোমের ফিমোনচিনো এয়ারপোর্টে অবতরণের পর তিনি সান্তা মারী মাজোরে বাসিলিকায় নীরব প্রার্থনায় কিছুটা সময় কাটান। ভাতিকানের প্রেস অফিস জানায়, পোপ মহোদয় মারীয়া সালুস পপুলিস মারীয়ার প্রতিকৃতির পদতলে প্রার্থনায় বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করেন।

ভূমধ্যসাগরীয় বৈঠকের চূড়ান্ত বৈঠকে অংশ নিতে পোপ মহোদয় ফ্রান্সের মার্সাই এ দুইদিন কাটান। তাঁর সফরের বেশিরভাগ সময়ই অভিবাসনের সমস্যা এবং প্রত্যেকের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন; এমনকি যারা অভ্যন্তরীণ অভিবাসী তাদের সাথেও। গত শনিবারে ভূমধ্যসাগরীয় বৈঠকে বক্তৃতাকালে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, সমুদ্র প্রাচীন রোমানদের কাছে ‘মারে নস্ট্রাম’ বা আমাদের সমুদ্র হিসেবে পরিচিত ছিল; যা ভাগ করা মানবতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সাক্ষাতের স্থান হিসেবে বর্তমানে বিবেচিত হতে পারে। আজকে সমুদ্র নিয়ে দ্বন্দ্বে মধ্যে আমরা ভূমধ্যসাগরের বৈঠকে এসেছি যাতে করে সকলে এখানে অবদান রাখতে পারে এবং শান্তি নিয়ে গৃহে পদার্পণ করতে পারে॥ - **তথ্যসূত্র :** *news.va*

ঢাকার আর্চবিশপ ভবনের শতবর্ষী পূর্তি লোগো উন্মোচন ও থিম সং-এর সূচনা পর্ব

নিউটন মণ্ডল ▯ ঢাকার আর্চবিশপ ভবনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে উন্মোচিত হলো লোগো ও প্রকাশিত হলো থিম সং। গত ২৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে কাকরাইলের সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল প্রাঙ্গণে লোগো উন্মোচন ও থিম সং সূচনা পর্বের মধ্যদিয়ে শুরু হয় এর আনুষ্ঠানিকতা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশপ থিয়োটোনিয়াস গমেজ সিএসসি, ফাদারগণ, গীতিকার ও সুরকার লিটন রিন্টু অধিকারী, সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পীবৃন্দ, জুবিলী কমিটি ও রমনা সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল পালকীয় পরিষদের সদস্য/সদস্যাগণ।

প্রথমেই উদ্বোধনী প্রার্থনা পরিচালনা করেন বিশপ থিয়োটোনিয়াস গমেজ। লোগো উন্মোচনকালে বিশপ বলেন, আমরা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমান এই ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। আজ আমরা এই ভবনের একশত বছর পূর্তি পালন করতে যাচ্ছি। স্বাগত বক্তব্যের পর তিনি শতবর্ষী পূর্তি লোগো উন্মোচন করেন। উন্মোচন শেষে থিম সং পরিবেশন করেন শিল্পীগণ। থিম সং যৌথভাবে রচনা করেছেন জনপ্রিয় গীতিকার ও সুরকার লিটন রিন্টু অধিকারী ও ফাদার আলবার্ট রোজারিও। অনুভূতি ব্যক্ত করে লিটন রিন্টু বলেন, আমি এ কাজটি করার আগে দু' দিন প্রার্থনা করেছি এবং তারপর কাজ শুরু করেছি। বলেছি, প্রভু এটি একটি মহতী কাজ, আমি যেন উপযুক্ত বাক্য ও সুর পাই। কারণ ঐ পর্যায়ের জ্ঞান ছাড়া আমার পক্ষে এটা সম্ভব হবে না। সমস্ত মহিমা, গৌরব ঈশ্বরের। কারণ তিনি শক্তি না দিলে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। উল্লেখ্য লগো তৈরিতে সহযোগিতা করে ঢাকা ক্রেডিট, মেট্রোপলিটান হাউজিং সোসাইটি ও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র। ফাদার আলবার্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন॥

বান্দুরা সেমিনারীতে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব উদ্‌যাপন

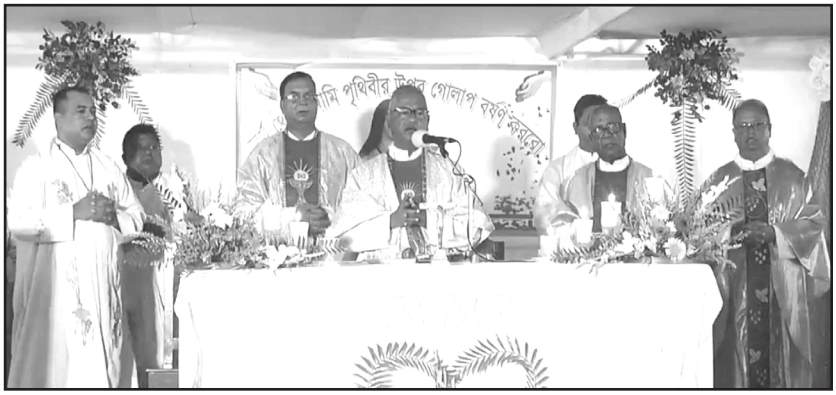

সজল বালা ▯ গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, বান্দুরা সেমিনারীর প্রতিপালিকা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে আরও ৭জন ফাদার উপস্থিত ছিলেন ।

শোভাযাত্রার মাধ্যমে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয়। সহভাগিতায় ফাদার গাব্রিয়েল বলেন," বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব এবং আশীর্বাদ এই ক্ষুদ্রপুষ্প বান্দুরা সেমিনারী। ২ বছর পরে সেমিনারীর ১০০ বছরের জুবিলী পালন করা হবে। বিগত ১০০ বছর ধরে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এই সেমিনারী অনেক অনেক অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ দিয়ে যাচ্ছে। এই সেমিনারী থেকে আমরা আর্চবিশপ, বিশপ, অনেক যাজক এবং ব্রাদার পেয়েছি।" তিনি আরও বলেন, ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা যেমন চার দেয়ালের মধ্যে থেকে অনেক মহৎ কাজ করেছেন আমরাও যেন পরিবারের মধ্যে থেকেও আমাদের সেবা ও ভালবাসার মাধ্যমে অনেক কাজ করতে পারি। আমরা তার মধ্যস্থতায় অনুনয় করি তিনি যেন স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য পুষ্পবারি বর্ষণ করেন।

খ্রিস্টযাগের শেষে এই সেমিনারীর ছাত্র যাজকীয় জীবনের ২৫ বছরের জুবিলী পালনকারী ফাদার জেমস ক্রুশ সিএসসিকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সেমিনারীর সহকারী পরিচালক ফাদার শিশির কোড়াইয়া উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষভাবে, বিগত ৯ দিন নভেনায় এবং পর্বদিনে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এরপর পর্বীয় আশীর্বাদিত বিস্কুট এবং কার্ড প্রদান করা হয়। সন্ধ্যায়, সেমিনারীর আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার জেভিয়ার পিউরিফিকেশনের পরিচালনায় ও সেমিনারীয়ানদের পরিবেশনায় যিশুর জন্মের পালা উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রায় ১৫০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন॥

মারীয়াবাদ ধর্মপল্লী, বোর্ণীতে সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার যোহন মিন্টু রায় ও ফাদার অনিল মারান্ডী ▯ গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার মারীয়াবাদ ধর্মপল্লী, বোর্ণীতে সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। ধর্মপল্লীর ফাদারগণ, সিস্টারগণ, পালকীয় পরিষদ, খ্রিস্টভক্তগণ ও সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের সোসাইটির সদস্য ও সদস্যার উদ্যোগে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে পর্ব পালন করা হয়। সকাল ৯টায় শোভাযাত্রা করে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ

শুরু হয়। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ফাদার যোহন মিন্টু রায়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের জীবনী তুলে ধরেন এবং তিনি বলেন যে, সাধু ভিনসেন্ট ডি' পল গরীব-দুঃখী, অনাথ-অসহায় ও বিধবাদের সেবা যত্ন করেছেন। আমরাও যেন তারই মত আমাদের খ্রিস্টীয় পরিবারে ও সমাজে সেবাকাজ করতে পারি। খ্রিস্টযাগে ছেলে-মেয়ে, খ্রিস্টভক্ত ও ভিনসেনসিয়ান ভাইবোনসহ প্রায় ১০০ জনেরও বেশি উপস্থিত ছিলেন।

খ্রিস্টযাগের পর দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ধর্মপল্লীর ফাদার এ কান্তন হলরুমে সকাল ১০:৪৫ মিনিটে। সেখানে ফাদার যোহন মিন্টু রায়, ফাদার অনিল মারাণ্ডী ও সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের সোসাইটির সদস্য ও সদস্যাদের ফুলের শুভেচ্ছা প্রদানের মাধ্যমে সোসাইটির কার্যক্রম শুরু হয়।

কার্যক্রমের শুরুতে সোসাইটির সভানেত্রী মালতি মাথিউস সবাইকে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি পিতা ঈশ্বরকে ও ফাদার-সিস্টারদের বিশেষ করে ফাদার যোহন মিন্টু রায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরোও বলেন, আমরা সকলেই যেন আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করি ও গরীব-দুঃখী, অনাথ ও অসহায় ভাই-বোনদের সাহায্য সহযোগিতা করি। আলোচনা শেষে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এবছর রোগী বাড়ি পরিদর্শন, অনুদান নিজেরা দিয়ে এবং অনুদান সংগ্রহ করে তাদের ঔষধ ও পথ্য কিনতে সহায়তা করা, বড়দিনে দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ ও সমস্যাগ্রস্থ পরিবার পরিদর্শন করা হবে।

পরিশেষে মালতি মাথিউস সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও জলযোগের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়॥ - ***তথ্যসূত্রঃ বরেন্দ্রদূত***

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল ও এনিমেটরদের বাৎসরিক সেমিনার

ডানিয়েল রোজারিও ▯ গত ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল ও এনিমেটরদের বাৎসরিক সেমিনার ২০২৩। উক্ত সেমিনারের মূলসুর ছিল "এসো ধর্ম শিখি ও বিশ্বাসে বেড়ে উঠি।" ২৭ সেপ্টেম্বর রাজশাহী খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে উক্ত সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, চ্যান্সেলর ফাদার প্রেমু রোজারিও, খ্রিস্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বাবলু কোড়াইয়া, ফাদার হারুন হেম্ব্রম, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস এর পরিচালক ফাদার পিউস গমেজসহ মোট ১৮৮ জন শিশু ও এনিমেটর।

শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী। ফাদার বাবলু কোড়াইয়া সবাইকে স্বাগত জানান ও তার সহভাগিতা তুলে ধরেন। এরপর বক্তব্য রাখেন ফাদার প্রেমু রোজারিও। তিনি সবাইকে প্রার্থনা করতে বলেন যেন সবাই শান্তিপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে পারে। ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন বিভিন্ন ফাদার ও সিস্টারগণ।

ফাদার পিউস গমেজ 'এসো ধর্ম শিখি ও বিশ্বাসে বেড়ে উঠি' মূলসুরের আলোকে সহভাগিতা করে বলেন, শিশুদের ভক্তির প্রকাশ ও পবিত্রতা, মর্যাদা ও গুরুত্ব ব্যাখা করা দরকার। মা বাবার দায়িত্ব হবে মা-মারীয়ার প্রতি ভক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য দেওয়া, সাধু-সাধ্বীদের জীবনী সহভাগিতা করা, রোজারিমালা প্রার্থনা শেখানো ও পারিবারিক প্রার্থনা পরিচালনা।

ফাদার বাবলু কোড়াইয়া তার উপস্থাপনায় বলেন,চ শিশুদের জন্য ধর্মপল্লীতে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এতে তোমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকা দরকার। এনিমেটর এবং যুবক- যুবতী আপনারা আপনাদের ধর্মপল্লীতে নানাবিধ কার্যে ফাদারগণকে সহায়তা করতে পারেন।

পিএমএস বাংলাদেশের জাতীয় পরিচালক ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ পিএমএস এর সম্পর্কে বিস্তারিত ধারনা প্রদান করেন।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা ২৭ ও ২৮ তারিখ রাতে বাইবেলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাটিকা উপস্থাপন করেন। একই সাথে শেষ দিন ভিকারিয়া ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর আলোচনা হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর ১১:৩০ মিনিটে উক্ত সেমিনারের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পিএমএস বাংলাদেশ এর পরিচালক ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ।

পরিশেষে ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ ও অন্যান্য ফাদারদের ফুল ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয় এবং ফাদার পিউস গমেজ সকলের দায়িত্ব- করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

রাজশাহীর আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে প্রথম পাপস্বীকার ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার গ্রহণ

পিটার ডেভিড পালমা ▯ নিত্য সাহায্যকারিণী মা মারীয়া ধর্মপল্লী, আন্ধারকোঠায় ৩০ সেপ্টেম্বর ও ০১ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, অনুষ্ঠিত হয় প্রথম পাপস্বীকার ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠান। ২৪জন ছেলে-মেয়ে দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি শেষে ভক্তি ভরে প্রথম পাপস্বীকার ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার গ্রহণ করে। ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেলে পাপস্বীকার প্রদান ও ০১ অক্টোবর সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রেমু রোজারিও। উপদেশে তিনি বলেন, "আজ যে ২৪জন সন্তান শুভ্র পোষাক পরিধান করেছে, এ শুভ্রতা হলো স্বর্গরাজ্যে যাবার মানদণ্ড। আর এ শুভ্রতা, পবিত্রাতা আমরা লাভ করতে পারি খ্রিস্টের মাধ্যমে, খ্রিস্টকে প্রতিনিয়ত গ্রহণ করে। সাধু তার্সিসিয়াস যেমন নিজের জীবন দিয়ে খ্রিস্টকে রক্ষা করেছেন, ঠিক তেমনি তোমাদেরও খ্রিস্টকে রক্ষা করতে হবে তোমাদের সুন্দর জীবন-যাপন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে।"

পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে পাল-পুরোহিত প্রথম পাপস্বীকার ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার গ্রহণকারী ছেলে-মেয়েদের মাঝে স্মৃতিচিহ্ন কার্ড বিতরণ করেন এবং অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেন॥

খুলনা ধর্মপ্রদেশে YCS ও যুব এনিমেটর প্রশিক্ষণ ২০২৩

নিকোলাস বিশ্বাস ▯ গত ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন, খুলনা এর উদ্যোগে "এনিমেটরগণ হলো যুব কমিশনের শক্তি" মূলসুরকে কেন্দ্র করে উক্ত ধর্মপ্রদেশের সকল ধর্মপল্লীর YCS ও যুব এনিমেটরদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে ৪০ জন এনিমেটর অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রশিক্ষণে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত ক্লাস, পবিত্র খ্রিস্টযাগ, আলোর উৎসব, বিনোদন ও সৃষ্টির উদ্‌যাপনকাল স্মরণ করে নড়াইল-মুলিয়া বাজার রাস্তার দুপাশে প্রায় ২ কিলোমিটার স্থানে ১৫০ টি তাল গাছের বীজ বপন করা হয়। এসময় এনিমেটরদের সঙ্গে মুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান, ফাদারগণ ও সিস্টারগণ অংশ নেন। প্রশিক্ষণে এনিমেটরদের গঠনের জন্য সহভাগিতা করেছেন ফাদার বাবলু লরেন্স সরকার, সিস্টার চম্পা রোজারিও, নিকোলাস বিশ্বাস। প্রশিক্ষণ পরিচালনায় ছিলেন ফাদার রিপন সরদার, যুব সমন্বয়কারী, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন-খুলনা এবং নিকোলাস উজ্জল হালদার, সেক্রেটারী, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন-খুলনা।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৩/১০/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হতে যাচ্ছে **Europe-Bangladesh Christian Alliance** আয়োজিত **EBCA Online Talent Show Competition 2023/24.** বিগত ৩ বছর যাবত এই প্রতিযোগিতাটি ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের শত শত খ্রিস্টান প্রতিযোগী এই প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়েছে। এবারের আয়োজনে থাকছে নাচ, গান, চিত্রাংকন, আবৃত্তি ও একক অভিনয়। থাকছে বয়স ভিত্তিক ছোট-বড় সবার জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ। প্রত্যেক প্রতিযোগীর পরিবেশনা ফেইজবুক পেইজের পাশাপাশি ইউটিউবেও প্রচার করা হবে। তাছাড়া বিজয়ীদের জন্য সর্বমোট ৬০টি পুরস্কার থাকবে এবারের আয়োজনে।

সকল আপডেট পেতে আমাদের ফেইজবুক পেইজে চোখ রাখুন:

https://www.facebook.com/Europe-Bangladesh-Christian-Alliance-101986462258014

অথবা নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন:

অথবা ভিজিট করুন: https://ebcainternational.org/

ধন্যবাদান্তে,
লেনার্ড রোজারিও
সম্পাদক, ইউরোপ বাংলাদেশ খ্রিষ্টিয়ান এলায়েন্স

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।
বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ৩৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 36
Regd. No. DA-33
❖ 8 - 14 October, 2023, ২৩ - ২৯ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

Embassy
of the Federal Republic of Germany
Dhaka

BHARATANATYAM

Workshop
In
DHAKA
Organized by
Embassy of the Federal Republic of Germany Dhaka
In Collaboration With
Bangladesh Jesuits

1st Nov-3rd Nov,2023
3 DAYS Workshop
WORKSHOP FEE : 1000TK
(Including AUDIO)

Conducted By
Mrs. Katja Shivani
(Bharatanatyam Exponent-
Natya Nityatva-Hamburg-
Germany)
&
Prof. Dr. Fr. Saju George,S.J
(Founder Director-Kalahrdaya-
Kolkata)

The workshop will have TWO SEPARATE GROUPS:
Morning Group:09:30 a.m. - 01:00 p.m.
Afternoon Group:03:00 p.m. - 06:30 p.m.
RNDM Renwal Centre, 24 Asad Avenue,
Mohammadpur Dhaka 1207
Certificates will be given to the participants
Age: Above 10 years old
01732875690/01772447538/01778225828

বিজ্ঞ/০০৫/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org